রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য : নাট্যিক প্রয়োগ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান

লায়লা ফেরদৌস*

[সারসংক্ষেপ : নাট্য ও নৃত্যের উদ্ভব একইকালে এবং অবশ্যই মানব-শরীরের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এর বিকাশ। আবার নাট্যের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে নৃত্যের ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়। দেশ-কাল-প্রতিবেশের ছাঁচে গড়ে ওঠা জীবিকাভিত্তিক জীবনসম্পৃক্ত আধুনিক বাংলা নাটক মানুষের সর্বপ্রকার ভাব, চিন্তা, কর্ম, আচরণ, শাস্ত্র, সমাজ, লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার সর্বোপরি সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্র-নাট্য এর ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্র-নাট্যে সংগীত ও নৃত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে প্রয়োগকৃত নৃত্যের ধারা ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানপূর্বক রবীন্দ্র-নাট্যে এর প্রয়োগ ও ব্যবহারের যাথার্থ্য আলোচিত হবে।]

সংস্কৃতি হলো নিরাভরণ ও নির্বিশেষ জীবনের প্রকাশ। তদ্‌বিবেচনায় মানব-সংস্কৃতিকে মানব-সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতম মনে হয়। সংস্কৃতি একক কোনো শিল্প উপাদানকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়নি। নাট্য, নৃত্য ও সংগীত – এই মৌল তিনটি উপাদানের উদ্ভব মানব-শরীরের ক্রমবিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত (সেলিম, ১৯৮৯ : ১০)। আদিমানবের প্রাথমিক শিল্প প্রয়াসকে তাই বলা হয় 'নৃত্যগীতানুষ্ঠান' (গীতাসেন, ১৯৭৫ : ১-২) বা নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত আচার বা অনুষ্ঠান। এ ধরনের পরিবেশনা মানুষের অনুকরণ প্রবৃত্তি[১] থেকেই অনুপ্রাণিত। তদ্‌বিবেচনায় বলা যায় যে, বাংলানাট্যের সাথে নৃত্যের সম্পর্ক প্রাচীন এবং তা অবশ্যই নাট্যের উদ্ভবলগ্ন থেকেই প্রবহমান। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য আধুনিক বাংলানাট্যের স্বতন্ত্র এক আঙ্গিক যেখানে নাট্যিকক্রিয়া প্রকাশের প্রধান মাধ্যম নৃত্য। 'রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য : নাট্যিক প্রয়োগ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান' শিরোনামে বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্যের উপাদান অনুসন্ধান। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্যের স্বাতন্ত্র্য ও নাট্যিক প্রয়োগ বিষয়ক বিবেচনা। তাই মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বাংলানাট্যে নৃত্যের প্রয়োগ অনুসন্ধান জরুরি; তৎসঙ্গে রবীন্দ্র নাটক ও রবীন্দ্র নাটকে নৃত্যের প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা ও আবশ্যক মনে হয়। কেননা বাংলানাটকে নৃত্যের প্রয়োগ প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র নাটকে নৃত্যের প্রয়োগ প্রসঙ্গের স্বরূপ অনুসন্ধান ও রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্যের নাট্যিক প্রয়োগ সম্পর্কে একটি সুস্থিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

বাংলা নাটকে নৃত্য ও অভিনয় এর যৌথ প্রয়োগের সন্ধান মেলে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন *চর্যাপদে*।[২] *চর্যাপদে* উল্লিখিত বুদ্ধনাটকের উদ্ধৃতি পাঠে এর পরিবেশনারীতি সম্পর্কে যে চিত্রকল্প অনুমিত হয়, তা খানিকটা এমন :

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

> নগর কোলাহলের অনেক দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আসর বসেছে। মাথায় ময়ূরের পাখা লাগিয়ে গলায় গুঞ্জাফুলের মালা জড়িয়ে নৃত্যের মুদ্রায় স্থির দাঁড়িয়ে এক নারী। ঢোলের শব্দে বেজে ওঠে তার পায়ের ঘুঙুর। চৌষট্টি পাঁপড়িযুক্ত একশো পদ্মের উপরে দাঁড়িয়ে সে নৃত্য করছে। আসরের চারপাশে দর্শকের ভিড়। সে আসরে বজ্রধন নাচছেন। (নীহাররঞ্জন, ১৪০০ : ৪৫০)

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, নৃত্য ও গীতের অদ্বৈত উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশিত হতো *চর্যাপদে* উল্লিখিত বুদ্ধনাটকসমূহ। অর্থাৎ বাংলানাটক সূচনালগ্ন থেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এ নাট্যপরিবেশনায় নৃত্যের প্রয়োগ হতো অভিনয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে নাট্যের উদ্ভবলগ্ন থেকেই।

বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি কোনো নির্দিষ্ট স্থান, ঘটনা কিংবা বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি, ফলে এর ইতিহাস পারম্পর্য নির্মাণ বেশ কঠিন প্রক্রিয়া। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত নিদর্শন বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যের আনুমানিক যুগবিভাজন সম্পন্ন। সঙ্গত কারণে বাংলা নাট্য ও নৃত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয়টি এখনো সুস্পষ্ট নয়। তবে বিশ্বসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের সমান্তরালে বাংলাসাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তৃতির ইতিহাস অন্বেষণ সম্ভব বলে ধারণা।

প্রাচীন মেসোপটেমীয়, মিশরীয়, গ্রিক, মায়া, আজটেক, ইনকা প্রভৃতি সভ্যতার পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। আদিম শিকার যুগের অরণ্যচারী জীবনায়নের দৃশ্যপটে মানবসৃষ্ট সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। ধারণা করা হয় মানুষ তার কণ্ঠস্বর দিয়ে প্রথম তার পরিচিত পশু-পাখির কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করেছিল। অঙ্গভঙ্গির ক্ষেত্রেও একই অনুমান প্রযোজ্য। কেননা আদিতে মানুষ ছিল প্রকৃতিরই একটা অংশ মাত্র – এই অনুকরণের বিষয়টি মানুষের স্বভাবজাত। মনুষ্যেতর প্রাণির সাথে মানুষের অন্যতম পার্থক্যও এখানে। দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর *'পোয়েটিক্স'* গ্রন্থে 'Imitation of an action' বা ক্রিয়ার অনুকরণ বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, মানুষ অনুকরণ করেও আনন্দ পায় আবার অনুকরণ করতে দেখেও আনন্দ পায়। অর্থাৎ মানুষ অনুকরণের দ্বারা তার চিত্তকে রঞ্জিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বিশ্ব সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের উৎস হিসেবে মানুষের এই চিত্তরঞ্জন বৃত্তির অবদান স্বীকার করা হয়। সভ্যতার আদিতেও মানুষ এই বৃত্তির অধিকারী ছিল বলে প্রমাণ মেলে পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষদের আঁকা গুহাচিত্রসমূহ থেকে। পূজোৎসব উপলক্ষ্যে কৃত আদিবাসীদের কৃত্যনির্ভর পরিবেশনায়ও এর নমুনা লভ্য। অস্ট্রেলীয় আদিম জাতিদের শিকারাভিনয় ও করোবরি নৃত্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উল্লিখিত আলোচনা থেকে মানবের বৃত্তি বা প্রবৃত্তি সম্পর্কিত ধারণা লভ্য।

আদিতে নাট্যকাহিনি দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হত আকারে, ইঙ্গিতে, সহজাত অনুকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করে। সে সাথে যুক্ত হলো ছন্দোবদ্ধ পদচারণা। আদিমানবের জীবনে ছন্দের সংযুক্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত :

> মানুষ যখন চতুষ্পদ থেকে দ্বিপদ হলো অর্থাৎ বানর প্রজাতির সঙ্গে তার প্রভেদ সূচিত হলো, তখন সে এক সমস্যার সম্মুখীন হলো। সমস্যা দেহের ভার সামলিয়ে চলা। শিশু যখন প্রথম দু'হাত পায়ের সাহায্যে হামাগুড়ি দেওয়ার স্তর থেকে দাঁড়াতে বা টলমল করে চলার চেষ্টা করে, তখন থেকেই তার মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির ক্রিয়া বাড়তে থাকে। এই ভার সামলিয়ে চলার ছন্দই প্রাথমিক নৃত্যছন্দ। (গায়ত্রী, ১৯৭৫ : ২০১-২০২)

তাই বলা যায়, মানুষ তার শরীরে প্রথম ছন্দ উপলব্ধি করেছে প্রকৃতিগতভাবে এবং গোত্রের সাথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন, শিকারের পিছনে দুর্বার গতিতে ছুটে চলা, আহার্য আহরণের জন্য সমতল ও উঁচু-নিচু ভূমিতে বিচরণ তাদের শিখিয়েছে ছন্দের গতি, প্রকৃতি ও চলন। সৃষ্টি জুড়েই ছন্দের বিচরণ। মাঠের ঘাসে হাওয়ার নাচন, চন্দ্র-সূর্যের উদয় ও অস্তগমন, নিজের হৃদস্পন্দন থেকেই মানবের প্রথম ছন্দ জ্ঞান লাভ হয়েছিল বলে বর্তমান গবেষকের ধারণা। তবে সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় : "হাত পায়ের সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলোর সঞ্চালনের ক্ষমতাকে মানুষ প্রথমে ব্যবহার করেছিল আহার্য, আত্মরক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে" (সেলিম, ১৯৮৯ : ৯)। ক্রমবিবর্তনের এক পর্যায়ে এ শিল্পবোধ ও শিল্পসত্তার বিভাজন ঘটলেও প্রাথমিক অবস্থায় তা ছিল অভিন্ন। তাই বলা যায়, প্রাচীন যুগের শিকারী মানব-মানবীর পালিত ধর্মীয় আচার, রীতি ও প্রাত্যহিক জীবনাচরণ থেকেই একই সময়কালে নাট্য ও নৃত্যের উদ্ভব ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনানিবহে উল্লিখিত নৃত্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত যা কাব্য ও নাট্যের অদ্বৈত আধার রূপেই বিবেচ্য। প্রাচীনধারার বাংলা নাট্যে গীত, নৃত্য ও বাদ্যই ছিল প্রধান। সেখানে সংলাপের ব্যবহার ছিল সীমিত। এতে পুরুষরাই নারী সেজে নৃত্যগীত করত। প্রাচীন যুগের শেষ দিকে, যাকে আমরা 'আদিমধ্যযুগ' বলি, সেখানে দেখা যায় গানে গানে ধর্মীয় তত্ত্বকথা প্রচার করার প্রয়াস। আদি-মধ্যযুগ তথা বাংলা ভাষায় রচিত প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ* এর প্রকৃত উদাহরণ। *চর্যাপদে* উল্লিখিত বুদ্ধনাটকের উদ্ধৃতি পাঠে এর পরিবেশনারীতি সম্পর্কে যে চিত্রকল্প অনুমিত হয়, তা থেকে ধারণা করা যায় বৌদ্ধ সহজিয়াগণ তাদের ধর্মকথা রূপক গল্পযোগে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন। এ পরিবেশনার মঞ্চ ছিল ভূমি সংলগ্ন বৃত্তাকার মঞ্চ এবং এ ধর্মীয় রূপক গল্পসমূহ অভিনেতা-অভিনেত্রী নৃত্য-গীত-বাদ্য সহযোগে দর্শক সম্মুখে অভিনয় করতেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের মত : "*চর্যাপদে* বজ্রযান ও সহজযানের গূঢ় ধর্ম, সাধনপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব নানা ধরনের রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের দ্বারা আভাস–ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে" (অসিতকুমার, ১৯৬৬ : ১৪)। *চর্যাপদের* পদকর্তাগণ সাধন ভজনের তত্ত্বকথা বললেও তারা মূলত কবিপ্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন পদ রচনায়। নমুনা স্বরূপ ৬ নং চর্যার একটি পদ উদ্ধৃত হলো :

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়িল চৌদীস ।।
আপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু আহেরি ।।
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিনা হরিনীর নিলঅ ন জানী।।
হরিনী বোল অ সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্ডো।।
ভরংগতে হরিণার খুব ন দীসঅ।
ভুসুক ভনই মূঢ় হি অহি ন পইসই।। (অসিতকুমার, ১৯৬৬ : ১৬)

উল্লিখিত পদে পদকর্তা 'ভুসুকুপাদ'[৩] পদান্তে দু'ধরনের সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহার করেছেন; প্রথমটি

হলো (।) যা প্রতি একবার গীত হবার নির্দেশনা দেয় এবং দ্বিতীয়টি (।।) যা দু'বার বা একের অধিকবার গীত হবার নির্দেশনা দেয়। পদে বর্ণিত কাহিনি সহজিয়া নির্বাণলাভের তত্ত্বদর্শন যা হরিণ শিকারের রূপক গল্প অবলম্বনে হেয়ালির ভঙ্গিতে রচিত। পদে উল্লিখিত গল্পাংশের হরিণ-হরিণী চরিত্র দু'টিতে দু'জন সিদ্ধাচার্য নিজেরাই অভিনয় করতেন এবং গীত ও নৃত্যের সহযোগে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন বলে বর্তমান গবেষকের মত। এ মতের সমর্থন পাই *চর্যাপদের* পদসমূহে।

চর্যাপদের পদগুলো যে নৃত্যগীত সহযোগে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত হতো তার উল্লেখ পাই *চর্যাপদের* ১৭ সংখ্যক *চর্যায়*। সেখানে উল্লেখ আছে :

> নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
> বুদ্ধ নাটক বিসমা ভোই। (সেলিম, ২০০৩ : ৩)

অর্থাৎ নাচ-গান ও বাদ্যসহযোগে বুদ্ধনাটক পরিবেশিত হতো। আবার *চর্যাপদের* ১০ সংখ্যক চর্যায়, নৃত্যপটিয়সী ডোম্বী নারীর সুনিপুণ নৃত্য প্রদর্শনের উল্লেখ পাই। চর্যাপদের ১০ম সংখ্যক চর্যায় উল্লেখ আছে :

> এক সো পদমা চউসট্ঠী পাখুড়ী।
> তহি চড়ি নাচই ভোম্বী বাপুড়ী ।। (Muhammad, 1966 : 30)

এখানে নৃত্যগীত পটিয়সী ডোম্বী নারীর উল্লেখ রয়েছে। দশম সংখ্যক *চর্যায়* আরও উল্লেখ আছে :

> আলো ভোম্বি তু পুছমি সদভাবে।
> আইসসি যাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ।। (সেলিম, ২০০৩ : ৬)

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রাচীন বাংলার নাট্যরীতি ও এর পরিবেশনা সম্পর্কে যে ধারণা লভ্য তা নাট্যপরিবেশনায় নৃত্যের সংযুক্তির ইঙ্গিতবহ। তাছাড়া *চর্যায়* নাট্যপরিবেশনায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের নাম এবং নাট্যাভিনয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে কৃত নৃত্যে ব্যবহৃত আহার্যাদি– নূপুর ও নেউরের উল্লেখ প্রাচীন বাংলার নাট্যপরিবেশনায় নৃত্যের প্রয়োগ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

প্রাচীনকালে নাট্য মাত্রই নৃত্যের সহযোগে পরিবেশিত। "সেকালে নৃত্য ও নাট্যের সাঙ্গীকৃত পরিবেশনার পরিচয় ও নমুনা পাওয়া যায় পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির ফলকে" (সরসী, ১৯৭৮ : ৪)। সমসাময়িক কালের প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ দেব-দেবী, অপ্সরা, গান্ধর্ব নারী, সেবাদাসী, নর্তকীদের দেহ ভঙ্গিমায় নৃত্যের গতি ও মুদ্রার ব্যবহার থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয়। একই ধরনের নমুনার সন্ধান লভ্য তিব্বত থেকে সংগৃহীত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রেখাচিত্রগুলোতে। রেখাচিত্রে দেখা যায় সিদ্ধাচার্যগণ নৃত্যের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে নৃত্যের হস্ত-মুদ্রা ও পায়ের ভঙ্গিতে চারী, তাদের পদবিক্ষেপে নৃত্যের গতি। রেখাচিত্রে দেখা যায় মীনপার পা দু'টো আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত। ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা। বৃদ্ধাঙ্গুল স্বাভাবিক রেখে অন্য চারটি আঙ্গুল ঈষৎ বাঁকানো। জলন্ধর দাঁড়িয়ে আছেন বামপায়ের উপরে, পায়ের ভঙ্গি কৌণিক, ডান পায়ের গোড়ালি কাঁধের উপরে। তাঁর পায়ের পাতার উল্টোদিকে ডান হাতের ভাঁজে, দুই হাত মাথার উপরে পরস্পর সংবদ্ধ। মীনপা ও জলন্ধর উভয়েরই পাশে নৃত্যপর নারীমূর্তি রয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায়, চর্যাকারদের কেউ কেউ সরাসরি প্রাচীন বাংলার নাট্য-পরিবেশনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তারা সকলেই নৃত্যপটিয়সী ছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত : "পাল আমলের বৌদ্ধ দেবদেবীর চিত্র সম্বলিত পুঁথি দৃষ্টে প্রাচীন কালের বাংলা নাটকের পরিবেশনায় নৃত্যের মুদ্রা, দৃষ্টিভেদ, আসন ও পদন্যাসের পরিচয় সংকেত পাওয়া যায়" (সরসী, ১৯৭৮ : ৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন যুগের পরিবেশনারীতির ধারাই মধ্যযুগ অবধি প্রবহমান। প্রাচীন যুগের মতো মধ্যযুগের বাংলা নাট্যও দর্শক সম্মুখে গীত এবং নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হতো। তবে মধ্যযুগে এসে এর সাথে উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়।

বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত রূপ নাথপন্থার সাধকগণের যোগ সাধনা বা কায়া সাধনার কাহিনি নিয়ে মৌখিকরীতিতে রচিত গল্প-গাঁথাই পরবর্তী সময়ে অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনি হিসেবে নাথ গীতিকা রূপে পরিচিতি পায়। নাথ গীতিকার অন্যতম নিদর্শন ফয়জুল্লা রচিত *গোরক্ষবিজয়* এর পরিবেশনায় সংগীত ও নৃত্যের যুগল সম্মিলনে যে নাট্যরীতি বুদ্ধ নাটকে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে প্রাচীনকালে তারই ধারাবাহিকতা ছিল বলে ধারণা। '*গোরক্ষবিজয়*' এর পরিবেশনা সম্পর্কে উল্লেখ আছে :

নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।।
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরীর রোলে।
কায় সাধ কায় মাদল হেন বোলে।।
হাতের ঠমকে নাচে পদ নাহি নড়ে।
গগন মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চরে।। (মুহম্মদ, ১৩৮২ : ৩৩)

উল্লিখিত অংশে নৃত্যসহযোগে গোরক্ষনাথের পদ পরিবেশনার উল্লেখ রয়েছে এবং ধারণা করা হয় গোরক্ষনাথ স্বয়ং একজন সুনিপুণ নৃত্যকর ছিলেন। তিনি ঘাঘরা ও চোলী পরে অর্থাৎ নারী বেশ ধারণ করে নৃত্য করতেন সাথে বাজত মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'মাদলের বোল পৌনঃপুনিক 'কায়সাধ' নিনাদিত হওয়াতে এই বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নাথপন্থীদের কায়াসাধনার সম্পর্ক প্রমাণিত হয়' বলে বিশেষজ্ঞের ধারণা। (মুহম্মদ, ১৩৮২ : ৩)

মধ্যযুগের নাট্য-পরিবেশনায় অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাই 'নাটগীত' শ্রেণির নাট্যবিশ্লেষণে। "মধ্যযুগের অভিনয় কলাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট *গীতগোবিন্দের* সাঙ্গীতিক আদর্শ এবং এর কাঠামো থেকেই বিকাশ লাভ করে 'নাটগীত' রীতি" (সৈয়দ, ১৯৯৫ : ১৬)। বাংলা ভাষায় রচিত নাটগীত শ্রেণির প্রথম নাট্য বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*[৪]। *গীতগোবিন্দের* পরিবেশনারীতি সম্পর্কে জানা যায় : "নৃত্য-গীত ও বর্ণনার মাধ্যমে এ কাজ আসরে পরিবেশিত হতো" (সেলিম, ১৯৯৬ : ২৮)। অর্থাৎ তা প্রচলিত বাংলা নাট্য-পরিবেশনারীতি দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। তবে এ পরিবেশনারীতি খানিকটা সেকালের উচ্চবিত্ত সমাজে প্রচলিত নৃত্যগীত রুচি দ্বারাও প্রভাবিত ছিল। *গীতগোবিন্দের* সাধারণ গদ্য অংশ শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত। *গীতগোবিন্দের* সামোদ-দামোদর সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ আছে :

বাগ্‌দেবতা-চরিত্র-চিত্রিত-চিত্ত-সদ্মা।
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী [...]।। (সুকুমার, ১৯৯১ : ৩৪)

উল্লিখিত উক্তি হতে ধারণা হয়, জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী ছিলেন মন্দিরের নৃত্য-পটিয়সী দেবদাসী। "তিনি পুরীর মন্দিরে সমর্পিতা ছিলেন বলেও জানা যায়" (দীনেশচন্দ্র, ১৯৮৬ : ২৩৪)। রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব, তিনি বাংলা তথা আধুনিক আর্যভাষার আদি কবিও বটেন, তাঁর রচিত *গীতগোবিন্দ* সাধারণ গদ্য 'শৌরসেনী প্রাকৃতে' রচিত হলেও এর প্রতিটি গীত ছিল শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী নির্ভর। *গীতগোবিন্দের* প্রথম সর্গের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে আছে :

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়।
কুরু কুশলং প্রণতেষু।। (সুকুমার, ১৯৯১ : ৩৪)

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশে 'বয়ম' শব্দটি *গীতিনাট্যের* 'গায়ক-বাদকদল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। *গীতগোবিন্দের* চরিত্র সংখ্যা তিন। এরূপ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়, *গীতগোবিন্দ* বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় আঙ্গিক বিবেচনায় বৃহদায়তন গীতিনাট্য হিসেবেই প্রচলিত ছিল এবং তা অবশ্যই নৃত্য সহযোগে দর্শক সম্মুখে পরিবেশিত হতো।

বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের অন্য আরেকটি সৃষ্টি বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। কাব্যের পরিসর, পৌরাণিক ও লৌকিক অনুষঙ্গের মিশ্রণে কাব্যপরিকল্পনা ও কাহিনির বিস্তার বিবেচনা করে "*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*কে মহাকাব্যরূপে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতজন" (সুকুমার, ১৯৯১ : ১৪৮)। তবে পরিবেশনারীতির বিচারে আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতজন একে নাটগীত শ্রেণির রচনা বলেই স্বীকৃতি দিয়েছেন (আশুতোষ, ১৯৮২ : ৩৩৬)। *নাটগীত* অবশ্যই উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক গীতি এবং তা আখ্যানমূলক। তাই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* সঙ্গে এর সাযুজ্য স্বীকার করা যায়। "নৃত্য ও গীত সহযোগে এই *নাটগীতে*র আঙ্গিক গড়ে উঠেছিল"– বলে বিশেষজ্ঞের ধারণা (সেলিম, ১৯৯৬ : ৫৭)।

'নাটগীত' ও 'গীতনাট্য' দু'ধরনের নাট্য-আঙ্গিক যা বাংলা নাট্যের আদি ও মধ্যযুগের জনপ্রিয় আঙ্গিকরূপে প্রচলিত ছিল। "নাটগীত মধ্যযুগের নাট্য-পরিভাষারূপেই গ্রাহ্য" (সেলিম, ১৯৯৬ : ৫৮)। তবে নাটগীতের একান্ত লক্ষণ যদি নৃত্য-গীত ও উক্তি-প্রত্যুক্তি হয়, তবে একই শ্রেণির বাংলা নাট্যাঙ্গিক– ধামালি, ঝুমুর প্রভৃতি। উল্লিখিত 'নাটগীত' ও 'গীতনাট্য' পৃথক দু'টি নাট্য আঙ্গিক' (সেলিম, ১৯৯৬ : ২৪)। মধ্যযুগের বাংলায় নাটগীত জনপ্রিয় নাট্য-আঙ্গিক হিসেবেই প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস অনূদিত *রামায়ণে* উল্লেখ আছে :

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহ বেদ পড়ে কেহ পঢ়য়ে মঙ্গলে।।
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে।। (আশুতোষ, ১৯৮২ : ৯১)

আবার শূন্যপুরাণের 'অথ ধর্ম্মের হাট' অংশে গীত আছে :

অপরূপ ধম্মর বাজার।
কেহ বেচে কেহ কিনে গীতনাট কেহ শুনে
কেহ দূরে করত পসার।। (চারু, ১৩২৬ : ৭৫)

তবে মধ্যযুগের জনপ্রিয় নাট্য-আঙ্গিক নাটগীত ও গীতনাট্য ধারার বিবর্তন ঘটেছে আধুনিক যুগে

এসে। বিবর্তন ঘটেছে এর বিষয়বস্তু এমনকি পরিবেশনারীতিতেও। শুরুর দিকে এ ধরনের নাট্যের বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক এবং রীতি ছিল গীতিময়– খানিকটা পাশ্চাত্যের অপেরার সদৃশ। ক্রমে পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে বর্তমান সময়ে এসে এর বিষয়বস্তু হয়েছে ঐতিহাসিক। এমনকি সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও রচিত হচ্ছে এ ধারার নাট্য এবং এর পরিবেশনারীতিতে গীতের সাথে সমান প্রাধান্যে যুক্ত হয়েছে সংলাপ। এই গীতিনাট্য শ্রেণির সমগোত্রীয় নাট্যআঙ্গিককেই বিশেষজ্ঞ বলেছেন নৃত্যনাট্য (সাধনকুমার, ১৯৬৩ : ৪৫৪)।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য প্রসঙ্গ

সাধারণ বিবেচনায় নৃত্য-গীত-বাদ্যসর্বস্ব নাট্য 'নৃত্যনাট্য' হিসেবে স্বীকৃত। নৃত্যনাট্য গীতিময় বা গীতভাষী এবং তা অবশ্যই সুর-লয় ও নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা। এ জাতীয় নাট্য কথা ও সুর অর্থাৎ মূল ভাবকে সমগ্রতা দিয়ে আঙ্গিক ও মানসিক (স্বাত্ত্বিক) গীতি ভঙ্গিমার বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়। গীতিনাট্যের লক্ষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : "তা গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। স্বভাবতই এ জাতীয় রচনায় সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে" (সাধনকুমার, ১৯৬৩ : ৪৫৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে জীবনের পরিহাস পরিবৃত্ত তৈরি করেছিলেন। অধ্যাত্ম রসের সাথে নিত্যদিনের অহংকার-উল্লাস, ব্যথা-ক্রন্দনও সেখানে অনুপস্থিত নয়। তাই নৃত্য-গীত বাদ্যসর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও নৃত্যনাট্যকে 'অভিজাত শ্রেণির নাট্যরীতির' (সাধনকুমার, ১৯৬৩ : ৪৫৪) স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষেই বিশেষজ্ঞের মত। 'রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য' প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্র–নাট্য সম্পর্কিত আলোচনা আবশ্যক। কেননা, রবীন্দ্র-নাট্য সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র-নাট্যের শাখা-আঙ্গিক, 'রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য' সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) স্বতন্ত্র আঙ্গিক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজস্ব পরিবৃত্ত তৈরি করেছিলেন। লোকায়ত নাট্যকলা, জীবন সংশ্লিষ্ট নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ভারতীয় নাট্যদর্শন ও ইউরোপীয় নাট্যকলা-নাট্যনির্মাণ কৌশল প্রত্যক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে নব-নাট্যধারার যে যাত্রা শুরু হয়, তা ছিল পরীক্ষণধর্মী। তাঁর রচিত নাটকের চূড়ান্ত আকারের অন্তরালে রয়েছে সংস্কার, সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও সংকোচনের ইতিহাস। বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে জানা যায় : "রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নাটককে পরবর্তীকালে রূপান্তর ও নামান্তর দিয়েছেন, তাছাড়া নতুন সংস্করণের সময়েও অনেক নাটককে প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত করেছেন" (অশ্রুকুমার, ২০০৯ : ১১)। স্রষ্টা হৃদয়ের অতৃপ্তিই মূলত এমনতর সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে। উল্লেখ্য যে, সাহিত্য রচনার ইতিহাসে সংস্কারের এ ধারা নূতন নয়।

বাস্তবোচিত বা পৌরাণিক একই কাহিনি অবলম্বনে একের অধিক নাট্যকারের এক বা একাধিক নাট্য রচনার উদাহরণ রয়েছে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু, নাট্য রচনায় স্বরচিত নাটক পরিমার্জন ও রচিত নাটকের প্রেক্ষাপট ঠিক রেখে একই কাহিনি অবলম্বনে একই নাট্যকার কর্তৃক একাধিক নাট্য রচনার ধারা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে, যার প্রকৃত উদাহরণ *রাজা*

ও রানী ও *তপতী* নাটক দু'টি। এরূপ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়– নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক এমনকি পূর্ববর্তী নাট্যকারদের ধারা থেকে বের হয়ে এসে নব্য ধারার সূচনা করেন। তবে শুধু নাটকের বিষয়বস্তু নির্মাণের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্ট ব্যতিক্রমী ধারা সীমাবদ্ধ ছিল না, নাটকের আঙ্গিক, ভাষাশৈলী ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্য এনেছিলেন। রবীন্দ্র-নাট্যসমূহ বিশ্লেষণে যে আঙ্গিকগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হলো :

ক. গীতিনাট্য
খ. কাব্যনাট্য
গ. সাঙ্কেতিক নাটক
ঘ. সামাজিক নাটক
ঙ. প্রহসন ও
চ. নৃত্যনাট্য।

*ছিন্নপত্রাবলী*তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে, তাতে তো বোধ করি কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার উপযুক্ত নয়। (মাহবুবুল, ২০০৯ : ৬৪৬)

ধারণা করা হয়, কবিগুরুর বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যে বিরাজমান ক্ষুধাই তাঁর উল্লিখিত বৈচিত্র্যময় নাট্যাঙ্গিকসহ অন্যান্য রচনার অনুপ্রেরণা এবং কবিতায় সকলের চেয়ে বেশি অধিকার ছিল বিধায় তাঁর নাট্যসংলাপও ছিল কাব্যিক। তথাপি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মূলত কবি, তাই তাঁর নাট্যরচনায় কবিসুলভ বৈশিষ্ট্যের রূপেই আবেগ, কল্পনা, তত্ত্ব প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। তাঁর নাটক কবি প্রত্যয়েরই বাহন, তবে অবশ্যই কবিতা থেকে ভিন্ন; যা বাংলা সাহিত্যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশশতকের প্রথমার্ধ রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগ বলে পরিচিত। *বাল্মীকি প্রতিভা* থেকে শুরু করে *রুদ্রচণ্ড*, *কালমৃগয়া*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *নলিনী*, *মায়ার খেলা*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *চিত্রাঙ্গদা*, *গোড়ায় গলদ*, *বিদায় অভিশাপ*, *মালিনী* ও *বৈকুণ্ঠের খাতা* এ সময়কালে রচিত নাটক। রবীন্দ্র নাট্য-প্রতিভা সম্পর্কে এডোয়ার্ড টমসন বলেছেন : "His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action" (অসিতকুমার, ১৯৭৩ : ৪৮২)। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকসমূহ সবই তাঁর কবিপ্রত্যয়ের বাহন মাত্র। তবে কবিমানস থেকে সৃষ্ট এ নাটকসমূহ ও নাট্যচরিত্রগুলো কবির ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাস, অনুভূতি ও তত্ত্বের প্রয়োগে স্বতন্ত্র এক ধারা তৈরি করেছে, যা আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যকে দেখিয়েছে নবীন ও গৌরবের পথ।

সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী নাট্যকারদের তৈরিকৃত পথে না হেঁটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৈরি করেছিলেন স্বতন্ত্র নাট্যধারা। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন কলাকৌশল, পরিবেশনারীতি মঞ্চসজ্জা ও চরিত্রচিত্রণসহ সকল ক্ষেত্রেই তিনি নূতনত্ব দেখিয়েছেন সাফল্যের সাথে এবং তাঁর নাটকে

বস্তুধর্মিতার চেয়ে রোম্যান্টিক আদর্শের অনুসৃতি লক্ষণীয়, তবে প্রচলিত প্রথা, ধর্ম, ব্যক্তিজীবন, সমাজবাস্তবতা, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা কোন বিষয়ই উপেক্ষিত নয় তাঁর নাটকে। "বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্বের সাহচর্য ও বিলেতের নাট্য ও সংগীত অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক পঠন-পাঠনের দ্বারা স্বতন্ত্র ধারার নাটক রচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন" বলেই বিশেষজ্ঞের মত (সাইফুল, ১৪১০ : ১০)। আত্মস্বভাবমূলক গীতিকবিতা বা গানই ছিল তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত বিকাশস্থল এবং তাঁর শিল্পমানস ছিল একান্তই স্বতন্ত্রধর্মী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ একান্ত আত্মভাব ও স্বতন্ত্র শিল্পমানস তাঁর প্রায় সমস্ত সৃষ্টিকে দিয়েছিল নতুন রূপ। তাঁর সৃষ্ট নাটকে ভাবধর্মী ও গীতিধর্মী কবিমানস আত্মপ্রকাশ করেছে। কাব্য ও তত্ত্বের মূর্তিই রবীন্দ্র নাটকের বিশেষ মূর্তি। বিশেষজ্ঞের মতে : "তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট লিরিক কবি বা গীতিকবি এবং তাঁর প্রতিভার স্বরূপই ছিল লিরিক্যাল বা গীতিধর্মী" (উপেন্দ্রনাথ, ১৭৭৯ : ২৭)। তাই তাঁর প্রথম নাট্য প্রচেষ্টাও সংগীতকে অবলম্বন করেই আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল। সংগীত রবীন্দ্র-নাটকে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

রবীন্দ্র নাট্য-প্রচেষ্টা সংগীতকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করলেও নৃত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ মেলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পচর্চাকেন্দ্র শান্তিনিকেতনে একাধিকবার শাস্ত্রীয় নৃত্যগুরুদের একত্রকরণ, তাদের নৃত্য প্রদর্শন ও প্রত্যক্ষণ এবং পরবর্তীকালে নাটকের নাট্যক্রিয়া প্রকাশের মূল উপাদান হিসেবে কেবল নৃত্যকে বেছে নেয়ার মাধ্যমে। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে কথাকলি, মণিপুরী, ভরতনাট্যম এমনকি মোহিনী আট্টম প্রভৃতি শাস্ত্রীয় নৃত্যের গুরুদেবদের একত্র করতেন এবং নৃত্যের আসর বসাতেন" (চৈতালী, ১৯৯৫ : ৩৩১)। সেসব আসরে নৃত্যগুরুদেবগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হতো শাস্ত্রীয় নৃত্যসহ বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্যকলা। ধারণা করা হয় যে, নৃত্যের প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যনাট্য রচনা করেন। নৃত্যের মধ্যে সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে নৃত্য ও সংগীতের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে একাধিক নাটক রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এগুলোর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের পরিবেশনায় নৃত্য ও সংগীতের প্রয়োগ ঘটানো হলেও নৃত্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে গীতাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, "এই গীতোৎসবে গীতের সঙ্গে বিচিত্র নৃত্যকলা; দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য, গুজরাটি গরবা নৃত্য, মণিপুরী নৃত্যের সাথে একই সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়" (প্রভাতকুমার, ১৩৬৬ : ১৫৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং জার্মানিতে বসে লেখা 'দি চাইলড' এর বাংলা অনুবাদ 'শিশুতীর্থ' আবৃত্তি করেন এবং অভিনেতা নৃত্য ও গীত সহযোগে সেটিকে মঞ্চে রূপায়িত করেন (প্রভাতকুমার, ১৩৬৬ : ১৫৫)। তদ্‌বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক যুগের প্রথমার্ধের নৃত্যজগতের একজন অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়; যিনি ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্য পদ্ধতির গৌরবকে পুনরাবিষ্কার করেন এবং এর সাথে সংযোজন ঘটান বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রচলিত জনপ্রিয় নাট্যের আঙ্গিক যা পরবর্তীকালে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের সঙ্গে আধুনিক নৃত্যের সংযোগ ঘটায়।

ভারতীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে 'আধুনিক নৃত্য' শব্দটির অর্থ ব্যাপক এবং অবশ্যই তা ব্যাপ্তিশীল। প্রচলিত

উচ্চাঙ্গ ধারার নৃত্যের কঠোর কলাকৌশলগত পদ্ধতি থেকে মুক্তিলাভ ও প্রচলিত লোকধারার নৃত্যের বিভিন্ন কলার সংযোজন ছিল "আধুনিক ভারতীয় নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য" (চৈতালী, ১৯৯৫ : ৩২৯)। এছাড়া নৃত্যের উপস্থাপনের সঙ্গে নানাপ্রকার পদ্ধতির সংমিশ্রণ, সাম্প্রতিক সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনিসমূহের উপস্থাপন নৃত্যসহযোগে, নৃত্য উপস্থাপনের সহযোগী হিসেবে আকর্ষণীয় মঞ্চসজ্জা, সুচারু প্রদর্শকের নিবেদন, সূক্ষ্ম শব্দ ও আলোকের ব্যবহার – এ সবই ভারতীয় আধুনিক নৃত্যের অগ্রগতির ইতিহাসের কাহিনির সাথে সম্পৃক্ত। "সংস্কৃতি সভ্যতার মতই পরিবর্তনশীল" (গায়ত্রী, ১৯৯৪ : ১৩) এবং অবশ্যই যুগে যুগে ঘটে এর রূপান্তর। অন্যান্য কলাবিদ্যার মতো নৃত্যকলারও আবয়বিক ও আন্তঃরূপ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন স্তরে, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সংস্কৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে প্রথম দিকে কথাকলি, মণিপুরী, ভরতনাট্যম এবং মোহিনী আট্টম প্রভৃতি নৃত্যের চর্চা শুরু করেন। অর্থাৎ তিনি প্রথম দিকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। টেগোর স্কুল অফ ডান্সও প্রথমদিকে 'লাবণ্যময়' ও 'লাস্যভঙ্গি' মণিপুরী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিখ্যাত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয় 'ব্যালে' জাতীয় নৃত্যআঙ্গিক। বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে জানা যায় : "ব্যালেসমূহ বহুশাস্ত্রীয় নৃত্য ঐতিহ্যের সর্বাপেক্ষা নতুন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত ও প্রয়োগ হয়েছিল রবীন্দ্র-নাট্যে" (চৈতালী, ১৯৯৫ : ৩৩১)। এ সময়ে শান্তিনিকেতনে নৃত্যগুরু হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে আসেন ত্রিপুরা রাজ্যের নৃত্যগুরু শ্রী নবকুমার সিং। তাঁর নির্দেশনায় প্রথম নৃত্যনাট্য প্রযোজনার নাম *নটীর পূজা*, যেখানে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী নন্দলাল বসুর প্রতিভাময়ী কন্যা গৌরীদেবী প্রধান চরিত্রে নৃত্য করেছিলেন। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ও শ্রী নবকুমার সিং নির্দেশিত *নটীর পূজা* নৃত্যনাট্যটি নৃত্যকরের লাবণ্যময় নৃত্যভঙ্গিমা, শৈল্পিক বেশভূষা ও মধুর সংগীত সংযোজনার কারণে চাঞ্চল্যকর সাফল্য অর্জন করেছিল" বলে বিশেষজ্ঞের ধারণা (চৈতালী, ১৯৯৫ : ৩৩১)। এখানে উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত অংশে *নটীর পূজা* নাটকটি নৃত্যনাট্য হিসেবে শ্রেণিকৃত হলেও ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য তাঁর *রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা* গ্রন্থে স্বকৃত রবীন্দ্র-নাট্য তালিকায় *নটীর পূজাকে* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *পূজারিণী* কবিতার পরিবর্তিত সংস্করণ ও মৌলিক নাটক হিসেবে উল্লেখ করেছেন (সাধনকুমার, ১৯৯৮ : ১১০-১১২)। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল তিনটি নৃত্যনাট্য লিখেছিলেন; আর তা হলো : ক. *চিত্রাঙ্গদা* খ. *চণ্ডালিকা* ও গ. *শ্যামা* (সাধনকুমার, ১৯৯৮ : ১১৭-১১৮)। ধারণা করা হয়, পরিবেশনার বৈচিত্র্যের কারণে এমন মতভেদের সৃষ্টি।

বাল্মীকি-প্রতিভা নাটকটি রচনার পর এ নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন : "*বাল্মীকি-প্রতিভা* সংগীতের এক নতুন পরীক্ষা" (ইন্দিরা, ১৩৬৯ : ১০৭)। *কাব্যগ্রন্থাবলী* (১৮৯৬) এর অন্তর্গত *বাল্মীকি প্রতিভার* ভূমিকা অংশে তিনি লিখেছেন : "এই গীতিনাট্যখানি [...] সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য" (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১১৪)। উল্লিখিত আলোচনা থেকে ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত গীতিনাট্য রচনার মধ্যদিয়েই নাট্যকার জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং তাঁর রচিত প্রথম গীতিনাট্য *বাল্মীকি-প্রতিভা*। তবে ইন্দিরা দেবী প্রমুখ রবীন্দ্র-নাট্য সমালোচকগণ মনে করেন : *বাল্মীকি-প্রতিভার* বনদেবীদের 'রিমঝিম' প্রভৃতি গান ও ডাকাতদলের 'কালী কালী বলো রে আজ' গানের সময় বাদ্যযন্ত্রের ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে পা

ঠুকে ও হাত নাড়িয়ে যে নৃত্যের আদল করা হয়, তাতেই নৃত্যনাট্য রচনার বীজ বপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *বাল্মীকি-প্রতিভার* গানগুলো নৃত্যসহযোগে উপস্থাপিত হলেও তা শাস্ত্রীয় বা নির্দিষ্ট কোন নৃত্য-আঙ্গিক অনুসরণ করে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকি প্রতিভা* নাটকের দস্যু চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতা শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : "সবাই মিলে চেঁচিয়ে গান ধরেছি আর সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি অর্গান প্রাণপণে টিপে বাজানো হচ্ছে আর সাথে উদ্দাম নৃত্য" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৮৮ : ১৫২)। অর্থাৎ নাটকের অভিনয়ের প্রয়োজনে কৃত নৃত্যকে তিনি বলেছেন 'উদ্দাম নৃত্য'। ঠিক তেমনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী উক্ত নাটকে প্রয়োগকৃত নৃত্য সম্পর্কে একই কথা ভিন্নভাবে বলেছেন : "'এত রঙ্গ শিখেছ' গানের সাথে ঢোলক বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে রঙ্গমঞ্চে লাফানোটা কতকটা স্বাভাবিক আনন্দ বিকাশের একটা ভঙ্গিমাত্র বলা যেতে পারে" (ইন্দিরা, ১৩৬৯ : ১০৮)। অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন : "ডাকাতদের কালী কালী বোলের সঙ্গে মাথার উপরে উচু করে ধরে টিনের তলোয়ার দিয়ে তালে তালে পা ঠুকে ফেলে যে নাচের অনুকরণ করা হত, তাকে কোন দেশী বলা যায় – তা জানিনে" (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১১৪)। উল্লিখিত আলোচনা থেকে ধারণা হয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম নাটক *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্য শ্রেণির রচনা এবং এর গীতগুলো নৃত্যসহযোগে মঞ্চে উপস্থাপিত হতো। এ নৃত্য নির্দিষ্ট কোনো ধারার নৃত্য এমনকি শাস্ত্রীয় অঙ্গের নৃত্যও ছিল না। তা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরি নিজস্ব ধারার নৃত্য বা 'রবীন্দ্র-নৃত্য'। রবীন্দ্র সংগীতের মতোই রবীন্দ্র-নৃত্যের ধারাও মৌলিক নৃত্যধারা বলে বর্তমান গবেষকের ধারণা।

১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন *মায়ার খেলা* নাটকটি। আশুতোষ ভট্টাচার্য *মায়ার খেলা* নাটককে "সর্বাপেক্ষা গীতিশ্রবণ নাটক" (সানোয়ার, ১৯৯৯ : ৪০) বলেছেন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন : "রবীন্দ্রনাথ রচিত *মায়ার খেলা*ই বিশুদ্ধ গীতিনাট্য এবং এ নাটকে গীতিরসই মুখ্য" (সানোয়ার, ১৯৯৯ : ৪০)। এই নাটকের অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বসন্ত ও মদন চরিত্রে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে মায়াকুমারীদের গান পরিবেশন করেছিলেন বলে জানা যায়। *মায়ার খেলা* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : তাঁর পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর–গদ্যনাটিকার সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে" (পুলিন, ১৩৬০ : ৯৮২)। সে গদ্যটির নাম *নলিনী*। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ একই নাটককে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে নৃত্যনাট্য হিসেবে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্র-নাট্য-গবেষক মনজুরে মওলা তাঁর *অল্প একটু রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন; যেখানে লেখা আছে :"*মায়ার খেলা* নাটকের অংশ বিশেষ নৃত্যনাট্যরূপে অভিনীত হবে শান্তিনিকেতনে সেবার দোল উৎসব উপলক্ষে" (সানোয়ার, ১৯৯৯ : ৪১)। সেবার দোলযাত্রায় শান্তিনিকেতনে *মায়ার খেলা* নাটকের অংশবিশেষ নৃত্যনাট্য রূপেই অভিনীত হয়েছিল তবে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিনাট্য *মায়ার খেলাকে* পূর্ণাঙ্গরূপে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। তাই পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত *রবীন্দ্র রচনাবলীর* প্রথম সংস্করণে *মায়ার খেলা* নাটকটি গীতিনাট্য হিসেবে ঠাঁই পেলেও দ্বিতীয় সংস্করণে গিয়ে তা নৃত্যনাট্যরূপেই রবীন্দ্র রচনাবলিতে ঠাঁই পায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিনাট্য *মায়ার খেলার* পরিবেশনায় নৃত্য প্রয়োগ করেছিলেন – বিষয়টি এমন নয়। তিনি নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে *মায়ার খেলাকে* পুনঃনির্মাণ করেছিলেন।

ঐতিহ্যবাহী বাংলা-নাট্যের পরিবেশনায় সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগ হয়ে আসছে উদ্ভবলগ্ন থেকে এবং তা পরিবেশিত হতো গীতিনাট্যের আদলে। সংগীত ও নৃত্যের ভেতর দিয়ে বাঙালির বহুমুখী সৃজনশীলতার যে বিস্তৃত রূপ পরিদৃশ্যমান তা দীর্ঘকাল ধরে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং অবশ্যই তা উপাখ্যান, কাব্য, নাট্য প্রভৃতির মধ্যদিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে, "সূচনালগ্নেই তা বিশেষ কোন রূপ পরিগ্রহ করেনি' (লায়লা, ২০১৮ : ১৯৮)। বাংলা নাট্যের উদ্ভবের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করে জানা যায়, অতীতে *চণ্ডীমঙ্গল*, *মনসামঙ্গল* এমনকি *অন্নদামঙ্গলের* মতো বৃহদায়তন কাব্যও নৃত্যসহযোগে গীত হতো আসরে (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩)।

ঐতিহ্যবাহী বাংলা-নাট্য ধারায় নৃত্য ও অভিনয়ের উপাদানের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায় বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে এই ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের শিল্পরুচি বিকশিত হয়েছিল তাদের নিজস্ব নাট্যরীতি ও অভিনয় পদ্ধতির ভেতর দিয়ে এবং সে নাট্যরীতি ও অভিনয় পদ্ধতি ছিল গীত ও নৃত্যনির্ভর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে নাট্যে নৃত্যের প্রয়োগ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আধুনিক যুগের বাংলা-নাট্য ধারায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সমসাময়িক সময়ে দেশের প্রচলিত নাট্যধারায় নৃত্যের ব্যাপক প্রয়োগ সত্ত্বেও পৃথকভাবে নাটকের মৌল উপাদান হিসেবে নাট্য-ঘটনার পাশাপাশি নৃত্যকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা নাটকের নব আঙ্গিক 'নৃত্যনাট্য' রচনা ছিল রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনের এক সাহসী পদক্ষেপ। প্রচলিত দেশীয় নাটকে নৃত্যের প্রয়োগ প্রসঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখে রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পত্র মারফত জানান : "এ দেশের উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। [...] এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায়, তখন সে নাচিয়ে তোলে। এদেশে মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে" (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১১৫)। উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে 'পুরুষ নাচে' শব্দটি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐতিহ্যবাহী বাংলা-নাট্য-আঙ্গিকসমূহ; যেমন : মাদার পীরের গান, অষ্টক গান, জারি গান, ঘাটু, আলকাপ বা যোগীগান প্রভৃতির পরিবেশনায় নারী চরিত্রে পুরুষদের নৃত্য করার প্রসঙ্গই বুঝাতে চেয়েছেন বলে ধারণা।

ঐতিহ্যবাহী বাংলা-নাট্যের ধারায় পুরুষদের নারীবেশ ধারণ করে আসরে নৃত্য পরিবেশনের ধারা নতুন নয়। এমনই এক নাট্য-আঙ্গিকের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ঘটে জাভা যাত্রার পথে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাভা যাত্রায় ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। যাত্রাপথে তাঁরা পুরুষদের পোষাকে মেয়েদের দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত এক ধরনের নৃত্যদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। সে নৃত্যদৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ প্রতিমা দেবীকে একটি চিঠিতে লেখেন : "দেহটা মেয়ের, কিন্তু লড়াইটা পুরুষের। এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা এ যেন" (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১১৫)। এমনই বিরুদ্ধতার সন্ধান মেলে ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্যের পরিবেশনায়; যেখানে দেহটা পুরুষের কিন্তু ছলা-কলা, চলন-ভঙ্গি সবই নারীর। উল্লিখিত বিপরীতমুখী দুই বিরুদ্ধতার সমাবেশই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে করা হয়।

সখী সমিতির কর্ণধার শ্রীমতি সরলা রায়ের অনুরোধে ১১৮৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বেথুন স্কুল প্রাঙ্গণে মহিলা শিল্পমেলা উপলক্ষ্যে *মায়ার খেলা* নাটকের সফল মঞ্চায়নের পর ১৮৯২ সালে এর

দ্বিতীয় মঞ্চায়নে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর মেয়ে বেশ ধারণ করে মায়াকুমারীদের গানে অংশগ্রহণ করেন। বহুকালের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত নাট্যের সঙ্গে নৃত্যের এমন যোগই অনুসন্ধান করে চলেছিলেন। অথচ বাংলানাট্য তথা বিশ্বনাট্যের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করে জানা যায় যে, নৃত্য ও নাট্যের উদ্ভব সমসময়ে এবং অবশ্যই তা মানুষের সহজাত অনুকরণ প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। 'নাট্য' শব্দটির নাম ধাতু হলো 'নাটয়' বা 'নাটকরা'; যার অর্থ দাঁড়ায় বিচিত্র সাজ-সজ্জা ও অঙ্গভঙ্গির সহযোগে অভিনয় করা' (রশীদ, ১৪২১ : ৮)। আবার ভারতীয় শাস্ত্র মতে, নৃত্য বা নাচ শব্দের অর্থ 'নটকম' (সুকুমার, ১৩৯১ : ১১)। আদিতে এই 'নটকম' বা নৃত্য এবং 'নটের কর্ম' বা নাট্য ছিল এক ও অভিন্ন (লায়লা, ২০১৮ : ২২৫)। এ অভিন্নতার ধারা আজও বহমান। তদ্‌বিবেচনায় রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যকে বাংলা নাট্যেরই আধুনিকতম শ্রেণিকরণ বলে মনে হয়, যা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'নৃত্যনাট্য' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসৃষ্ট এক অভিনব সৃষ্টি। সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্য – এ তিন কলার সমন্বয়ে সৃষ্ট নৃত্যনাট্য রবীন্দ্র ঋতুনাট্যেরই পূর্ণরূপ। ঋতুনাট্য হলো খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে ছোট ছোট নাচ। এই টুকরো টুকরো নাচগুলো কিছুক্ষণের জন্য দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে আবার নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ যতক্ষণ দর্শক সম্মুখে এ নাচ প্রদর্শিত হতো ততক্ষণ এই মুগ্ধতা স্থায়ী হয়। কিন্তু, এই গীতনৃত্যগুলো দর্শক হৃদয়ে স্থায়ী কোনো 'রসের'[৫] সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তাই নাট্য-কাহিনি বা 'বীজ'কে নৃত্যের বিষয়বস্তু মেনে যে আঙ্গিক সৃষ্টি করলেন রবীন্দ্রনাথ তাই নৃত্যনাট্য। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত :

> খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে সেই টুকরো টুকরো নাচগুলো ফুলঝুরির মতো দর্শকদের চক্ষুকে ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হইত; – হৃদয়ে কোন স্থায়ী রসের পদচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিত না। তাই চেষ্টা করা হইলো নাটকের কোনো ঘটনাকে নাচের বিষয়বস্তু করিবার জন্য। (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪২৫)

অর্থাৎ নাট্যঘটনাকে গীতের মাধ্যমে শ্রবণযোগ্য ও নৃত্যসহযোগে দৃশ্যমান করার আঙ্গিকই হলো নৃত্যনাট্য। এ বিষয়ে শান্তিদেবের বিবরণে পাই : "এগুলো হলো নৃত্যনাট্য, নাচের কথা চিন্তা করে লেখা। নাচের দরুণ এই নাটকের গানে বাঁধাছন্দের দোলার দিকে নজর রাখতে হয়েছে" (শান্তিদেব, ১৩৬৮ : ১৫৪)। অর্থাৎ নৃত্যনাট্যে নাট্য-ঘটনাকে মূল বিষয় ধরে নৃত্য পরিকল্পিত হলেও নৃত্যই ছিল এ ধারার নাট্যের মূল লক্ষ্য। একই বিষয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন : জাভায় যাহা ছিল কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা সংগীতসনাথ নৃত্য-নাটিকায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে সংগীত, নৃত্য ও নাট্যের প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাভায় দেখা নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও নৃত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ তৈরি হয়েছিল আরও আগে থেকে; নৃত্যনাট্য রচনারও বহু পূর্বে। নৃত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহই একথা প্রমাণ করে; এবং তাঁর গীত, কবিতা, নাটক ও নৃত্যনাট্যে প্রয়োগকৃত নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল অভিন্ন।

১৮৭৮ সালে প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি অনুষ্ঠানে "*আয় তব সহচরি/হাতে হাতে ধরি ধরি/নাচিবি ঘিরি ঘিরি/গাহিবি গান*" গানের সাথে নৃত্য সংযোজন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এ নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত

: "He Said, Come friends, let us dance and sing holding hands. He made the dance hold their hands and take rounds' (Sruti, 2021 : 17). অর্থাৎ উল্লিখিত নৃত্যের আঙ্গিক ছিল সরল। গীতস্থিত শব্দের অর্থ বা গানের মূলভাব প্রকাশের জন্য কোনো মুদ্রা বা শাস্ত্রীয় চলন ব্যবহার করা হয়নি। তবে হাত ধরে বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে ঘোরার এই পদ্ধতির সাথে ইউরোপিয়ান 'Round Dance' এবং 'Square Dance' এর সদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ইউরোপিয়ান 'Ball Dance'-এ এধরনের 'Round Dance' ও 'Square Dance' এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশেষজ্ঞের আলোচনায় জানা যায় :

> In his letters from Europe, he wrote about certain dance of Europe like the Fancy Ball, the Ballroom Dance, Round Dance, Square Dance, Gallop and Lancer. He himself and danced the Gallop and Lancer. (Sruti, 2021: 17)

অর্থাৎ ইউরোপ ভ্রমণের সময় লভ্য নৃত্যের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উল্লিখিত গানের অভিনয়ে নৃত্য সংযোজন করেছিলেন, যা ছিল কেবল মনের আনন্দে নেচে উঠবার জন্য করা নৃত্যের শামিল এবং ভাব প্রকাশের কোনো উদ্দেশ্য সেখানে ছিল না। গীতবাদ্যের ছন্দে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কেবল নান্দনিক চিত্রকল্প তৈরির প্রয়াস সেখানে লক্ষণীয়। এভাবে কখনও গুজরাটি গরবা, কখনও ইউরোপিয়ান বলডান্স, ব্যালেম কথাকলি, মনিপুরি বা বাংলার বাউল ও অন্যান্য লোকায়ত নাচের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত গান ও কবিতার ভাব-রস ফোঁটাতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের মত : "তিনি নির্দিষ্ট কোন নৃত্যরূপ অনুসরণ করেননি। তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় লোকজ, শাস্ত্রীয় ও বিদেশী নৃত্যরূপ।"[৬] এবং তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর তত্ত্বাবধায়নেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিবেশনার মধ্য দিয়ে গীত-নৃত্যের এ ধারাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতিনাট্য *বাল্মীকি-প্রতিভার* মঞ্চায়নেও উল্লিখিত ধারার নৃত্যের প্রয়োগ হয়েছিল বলে জানা যায়। *বাল্মীকি-প্রতিভা* গীতিনাট্য রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে জানা যায় : বিদ্বজ্জন সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮১ সালে এই নাটকটি রচনা করেন এবং তাঁর নির্দেশনাতেই ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৮৮১ এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। উক্ত নাটকে সুরারোপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশি সুরের সাথে বিদেশি সুরের সংমিশ্রণ ঘটান। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত : "দেশী ও বিলেতী সুরের চর্চার মধ্য দিয়ে *বাল্মীকি-প্রতিভার* জন্ম হইল"।[৭] যদিও এই নাটকে সঙ্গীত নয় বরং নাট্য-ঘটনাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ নাট্য-ঘটনাকে মঞ্চে রূপদেয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে নৃত্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের সুরারোপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈঠকি রীতি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব সুরধারা ও বিদেশি সুর (আইরিশ ও ইউরোপিয়ান) দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং এই মিশ্রসুরে রচিত গানের সাথে যে নৃত্য সংযোজিত হয়েছিল এবং এটি ছিল প্রচলিত বাংলা গীতিনাট্য ধারায় প্রয়োগকৃত নৃত্য থেকে ভিন্নতর। রবীন্দ্র সমসাময়িককালে বাংলা গীতিনাট্যধারা পরিবেশিত হতো পাঁচালি, পালা বা কীর্তনের রীতি অনুসরণ করে। "পাঁচালি মাত্রই পালাভিনয়" (সচ্চিদানন্দ, ১৯৭৪ : ৩৯৫)। বিশেষজ্ঞের মতে : "সচরাচর বাংলা আখ্যান কাব্য মাত্রই পাঁচালি– যা গীত হতো এবং এর কিছু অংশ নাচের তালে অভিনীত হতো" (সেলিম, ২০০৩ : ৭৫)।

পাঁচালির পঞ্চ অঙ্গের মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'বৈঠকি রীতি' এবং গীত ও নৃত্য সহযোগে অভিনীত অংশের নাম 'নাচাড়ি'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে সুরারোপের ক্ষেত্রে 'বৈঠকি রীতি'র খানিকটা অনুসরণ করলেও নৃত্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'নাচাড়ি রীতি'র বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি কখনই। কেননা, নাচাড়ি অংশ পরিবেশিত হতো গায়েন দোহার রীতিতে, কিন্তু, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য পরিবেশন করে কেবল নাট্যস্থিত চরিত্রসমূহ।

রবীন্দ্র-ঋতুনাট্যের পরিবেশনায় দেখা যায় একজন ভাব ব্যাখ্যাকারী প্রথমে মঞ্চে উপবিষ্ট হন। এরপর প্রকৃতি প্রতিনিধিরূপে অসংখ্য চরিত্রের আগমন ঘটে মঞ্চে। তারা সবাই মিলে নেচে গেয়ে দর্শক সম্মুখে নাট্য পরিবেশন করেন। আপাতদৃষ্টিতে এই নৃত্যাভিনয় পালাভিনয়ের অনুরূপ মনে হলেও আসলে তা চরিত্রাভিনয়। "মঞ্চস্থিত প্রতিটি চরিত্র প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবকে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে ঋতুনাট্যের আসরে উপস্থাপন করেন নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে।"[৮] 'পাঁচালি' নাট্যের পরিবেশনাদৃষ্টে জানা যায় যে, এতে মূল গায়েন মূল আখ্যান পরিবেশন করেন এবং দোহারগণ তাল, লয়, সুর সংশ্লিষ্ট ধুয়া ধরেন। রবীন্দ্র-নাট্যে এ ধরনের পরিবেশনের লক্ষণ অনুপস্থিত। এছাড়া পাঁচালিতে কাহিনি বা আখ্যান পরিবেশন করা হয় কথকতার ধরনে রচিত গদ্য দ্বারা এবং এই গদ্যের বৃহদাংশ অবশ্যই পূর্বে রচিত নয়, আসরে তাৎক্ষণিকভাবে গায়েন কর্তৃক সৃষ্ট। রবীন্দ্র-নাট্যের পরিবেশনায় এ ধরনের ইম্প্রোভাইজেশন রীতি প্রয়োগ করা হয় না। এ নাট্য পরিবেশিত হয় পূর্বে রচিত নাট্যের পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে।

ঐতিহাসিক বাংলা-নাট্য আঙ্গিক 'পালা' বা 'গীতিকা-পালা'সমূহ পরিবেশনার দিক থেকে পাঁচালি ধারার অনুরূপ। তবে পাঁচালি পরিবেশনার কৃত্যের অনুষঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত। 'পালা' ও 'কীর্তন' উভয় নাট্য-আঙ্গিকের পরিবেশনায় দেখা যায় মূল গায়েন আখ্যান পরিবেশন করেন এবং পাছ-দোহারগণ বাজনার তালে তালে ধুয়া ধরেন। আখ্যান পরিবেশনের সময় গায়েন আখ্যানস্থিত কিছু অংশ গীত আকারে পরিবেশন করেন এবং পায়ে তাল সমেত কিছু অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করেন। পাঁচালি, পালা ও কীর্তন – ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আঙ্গিকসমূহের পরিবেশনায় অভিনেতারা চরিত্রানুগ পোশাক পরিধান না করে সাধারণ পোশাক যেমন– লুঙ্গি, বা ধুতির সাথে ফতুয়া বা শার্ট কখনও কখনও গেঞ্জি পরিধান করেন এবং কোমরে বা মাথায় বাঁধা থাকে গামছা বা ছোটো কোনো কাপড়ের টুকরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত নাট্য-আঙ্গিকসমূহকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তিনি প্রচলিত বাংলা নাটগীতের ধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে গীতিনাট্য ও পরবর্তী সময়ে নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন তাতে প্রয়োগকৃত গীত ও নৃত্যের ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা ক্রমান্বয়ে 'রবীন্দ্রসংগীত' ও 'রবীন্দ্রনৃত্য'[৯] হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা *বাল্মীকি-প্রতিভা* এমনকি *মায়ার খেলা* রচনার ক্ষেত্রে সুরকেই একান্তভাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ঋতুনাট্যের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এরপর শুরু হয় তাঁর স্বরচিত কবিতাসমূহের সাথে সুর সংযোগের প্রয়াস। আরও পরিণত বয়সে গিয়ে তিনি উল্লিখিত গীতের সাথে নৃত্যের সন্নিবেশ ঘটান। যেখান থেকেই জন্ম নৃত্যনাট্যের। ঋতুনাট্যে যেখানে গানের

প্রাধান্য বেশি ছিল যদিও নৃত্য বর্তমান; অনুরূপভাবে নৃত্যনাট্যে ছিল নৃত্যের প্রাধান্য যদিও গান বর্তমান; বিশেষজ্ঞ যাকে তুলনা করেছিলেন "গঙ্গা-যমুনার ধারার সাথে" (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪০২)।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বরচিত গান, কবিতা ও নাট্যে নৃত্য প্রয়োগের কারণ হিসেবে দু'টি বিষয় সামনে আসে:

ক. গানকে নির্দিষ্ট কথা ও সুরের পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গির দ্বারা প্রকাশের মাধ্যমে গানের ভাবকে দর্শকের কাছে আরও সহজবোধ্য করে তোলা;

খ. নৃত্যকে গানের অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে গানের সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টা করা।

যদিও গান হলো অতি সূক্ষ্ম; অতীন্দ্রিয় ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাট্যরচনা শুরু করেছিলেন কেবল গানকে অবলম্বন করেই এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সংগীতে ।

প্রাচীন বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে খণ্ড খণ্ড গানের সাথে নৃত্য প্রদর্শনের রীতি প্রচলিত ছিল। এমনকি চর্যাপদের আখ্যাকাব্যগুলো গীতনৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হতো। "এ ধারার নৃত্য বাদ্যের তালের উপরে নির্ভরশীল ছিল" (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪০২)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নৃত্য প্রয়োগ করা হতো গানের উপর ভিত্তি করে। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের মত : "গানের কথা অনুসরণ করিয়া সাহানা, ভৈরবী, বাগেশ্রী, পরজ, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি বহু বিচিত্র সুরের ধারা ছুটিয়েছে, এইসব ধারার সম্মিলনে *নৃত্যনাট্য* একটা বিরাট সুরের রূপ ধারণ করিয়াছে" (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪৩২)। অর্থাৎ কথার উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ও বাউল অঙ্গের সুর সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু নৃত্য প্রয়োগের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো রীতির হুবহু অনুস্মরণের কথা জানা যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের মতো রবীন্দ্রনৃত্যে মুদ্রার প্রাধান্য পরিলক্ষিত নয়। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য ছিল মুদ্রানির্ভর নৃত্য। যেখানে নৃত্যের প্রারম্ভে শাস্ত্রীয় মুদ্রা সহযোগে হাব-ভাব প্রদর্শিত হতো তারপর শুরু হলো নৃত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যে এ ধারার নৃত্য উপেক্ষিত। যেমন : নৃত্যনাট্য *চণ্ডালিকা*র মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে কথাকলি আঙ্গিকের নৃত্যধারা গৃহীত হলেও তা ছিল মুদ্রাবর্জিত। অর্থাৎ কথাকলি নৃত্য আঙ্গিক থেকে কেবল ভঙ্গিমা ও তাল-লয়ের অংশটি গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুদ্রা অংশ নয়। ধারণা করা হয় যে, যেহেতু শাস্ত্রীয়নৃত্যমুদ্রা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় এবং রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য যেহেতু সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত তাই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য প্রয়োগের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সচেতনভাবেই শাস্ত্রীয় মুদ্রা উপেক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রনৃত্য অর্থাৎ রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে প্রয়োগকৃত নৃত্যের সংজ্ঞার্থ হিসেবে বলা যেতে পারে : যেখানে ভাবকে প্রকাশ করার জন্য কেবল সুর যথেষ্ট নয়, সেখানে ভাবকে সহজবোধ্য ও নান্দনিকরূপে প্রকাশের নিমিত্তে তাল-লয়-সুর ও বাণী সহযোগে যে ছন্দোময় অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করা হয় তাই রবীন্দ্রনৃত্য। এ নৃত্য-নির্দিষ্ট কোন নৃত্যধারার অনুবর্তী নয় বরং বিভিন্ন ধারার দেশি-বিদেশি নৃত্য থেকে যখন যেখানে ভাব প্রকাশের নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন তা গ্রহণ করা হয়েছে।

শেষ জীবনে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি রচনা করেন *চিত্রাঙ্গদা*, *শ্যামা*, *চণ্ডালিকা* প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য। সে সময়েই তিনি গীতিনাট্য *মায়ার খেলা*কে নৃত্যনাট্যে রূপদান করেন। তাই ধারণা করা হয়, যা কেবল কথকতায় বা কেবল সুরে অথবা কথকতা ও সুর সহযোগেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তা প্রকাশের নিমিত্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন। নৃত্যনাট্যের রয়েছে নির্দিষ্ট একটি আখ্যান যা সুর-তাল-লয় ও নৃত্য সহযোগে দর্শক সম্মুখে অভিনীত হতো। একটা দীর্ঘ আখ্যায়িকা যে কেবল নৃত্যের দ্বারা মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব; এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাভ করেছিলেন জাভা বা যবদ্বীপের নৃত্য থেকে। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত : মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ, সুখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলেছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সেটা হয় নাচ[১০]।

জাভাযাত্রীর পত্র থেকে যবদ্বীপে দেখা নৃত্য সম্পর্কে আরও জানা যায়– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে জাভার নৃত্য হলো প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প বলা। এর থেকে এটা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা[১১] ভোগ করাবার জন্যই নাচ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নাচকে ব্যবহার করলেন নাট্য-ঘটনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এবং এ সময় তিনি **'শাপমোচন'** কবিতাটিকেও নৃত্যনাট্যের ঢঙে নতুন করে লেখেন। **'শাপমোচন'** এর নতুন নৃত্যনাট্য রূপের পরিবেশনা সম্পর্কে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং মঞ্চের এক পাশে দাঁড়িয়ে **'শাপমোচন'** পাঠ করেন এবং অভিনেতারা মঞ্চে নৃত্য সহযোগে তা পরিবেশন করেন। **'শাপমোচন'** *এর* পরিবেশনায় দেশি ও বিদেশি নৃত্যের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল। এতে ব্যালের নৃত্যধারা অনুসৃত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **'শাপমোচন'** এর অভিনয়ে যন্ত্রসংগীত সর্বস্ব ব্যালে ডান্সের যন্ত্রসংগীতের অংশটিকে উপেক্ষা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবী তাঁর *নৃত্য* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন : "শান্তিনিকেতনের নাচে বাজনার বৈচিত্র্য তেমন হয়নি; তার কারণ গুরুদেবের সংগীত ও সুর বাজনার অভাব পুরিয়ে দেয়" (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪৩৬)। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের পরিবেশনায় যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার হতো কেবল সংগীত ও নৃত্যের তাল ঠিক রাখবার জন্য। বাদ্যযন্ত্রের অধিক ব্যবহারে নাট্যঘটনা প্রকাশে বাঁধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকেই নৃত্যনাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা পরিহার করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। তবে আখ্যান বা নাট্য-ঘটনা প্রকাশের বাহন হিসেবে সৃষ্টির সময় প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথা থেকে শুরু করেছিলেন – নৃত্যকল্পনা, সুর লহরি তৈরী নাকি উপযুক্ত কথামালা গাঁথা – সে সম্পর্কে মতান্তর রয়েছে।

প্রতিমা দেবী তাঁর *নৃত্য* নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, *চিত্রাঙ্গদা* নাট্যকাব্যটির প্রত্যেকটি কবিতা ও সংগীত নাচের জন্য উপযোগী বিধায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীতে উক্ত কাব্যনাট্যটিকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *চিত্রাঙ্গদা* নাট্যকাব্য রচনার প্রায় চল্লিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটিকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন; প্রথমটির রচনাকাল ১৮৯২ এবং দ্বিতীয়টি রচিত হয়েছে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাই ধারণা করা হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যনাট্যের আখ্যান প্রকাশের জন্য প্রথমে সংগীত তৈরি করেছেন এবং সংগীত অনুযায়ী কল্পিত হয়েছে নৃত্য। "তবে

কাব্যনাট্যের *চিত্রাঙ্গদা* ও নৃত্যনাট্যের *চিত্রাঙ্গদা* ভাবার্থে এক বলেই বিশেষজ্ঞের ধারণা" (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪৩৬)।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য উভয়রূপ পাঠ ও মঞ্চায়ন থেকে যে অভিজ্ঞতা লভ্য তা হলো কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদায়* বৃহৎ বর্ণনাসহযোগে উপস্থাপিত হয়েছে এমন অনেক বিষয় নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদায়* কেবল নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চে মূর্ত করা হয়েছে। যেমন : বসন্তের মোহিনী মায়ার কথা, যা কাব্যনাট্যে বর্ণিত আছে অথচ নৃত্যনাট্যে তা নৃত্য ও গীতের উচ্ছলতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত। শিকার করার সময় নিজের প্রেম নিবেদনের ব্যর্থতার যে করুণ কাহিনি চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে নিজের মুখে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে, নৃত্যনাট্যে তা কেবল দৃশ্যায়ন হয়েছে; সংলাপবিহীন ছিল সে উপস্থাপন। রবীন্দ্রনৃত্যের শক্তি এখানেই। নাট্যস্থিত অনেক বিষয় কেবল নৃত্যের মাধ্যমেই দর্শকের বোধগম্য করে তোলা যায়। "বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে"– গানটির সাথে যে নৃত্য সংযোজন করা হয়েছিল তাতেই চিত্রাঙ্গদার লজ্জিত স্থিতমুখ প্রকাশমান হয়েছিল; মঞ্চে দাঁড়িয়ে আলাদা করে এ কথা আর বলার প্রয়োজন হয়নি। কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা* পাঠে দেখা যায় প্রেমোন্মাদনায় মত্ত অর্জুনের অবস্থা বর্ণনা করছে চিত্রাঙ্গদা সংলাপের মাধ্যমে :

> সেই [....]
> তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিঃশ্বাসী
> হোমাগ্নিশিখার মতো [...] উত্তপ্ত হৃদয়
> ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া।। (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১২৪)

নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদায়* উল্লিখিত অংশটি নৃত্যসহযোগ বর্ণিত অর্জুনের নিজের সংলাপে মূর্ত হয়েছে মঞ্চে। অর্থাৎ উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে প্রয়োগকৃত নৃত্যনাট্য কাহিনি প্রকাশের মাধ্যমকে সহজতর করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন : "তাঁর রচিত কাব্যনাট্য লিরিক্যাল হলে নৃত্যনাট্য ড্রামাটিক" (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১২৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গ্রিক ভাষা থেকে আগত 'ড্রামা' শব্দটির অর্থ হলো 'অ্যাকশন' বা কোনো কিছু করে দেখানো। বাংলা নাটক, নাট্য, নট, নটী প্রভৃতি শব্দও এসেছে 'নট' ধাতু থেকে। বাংলা 'নট' শব্দের অর্থ নড়াচড়া করা। নাটকের মধ্যে এক ধরনের গতি থাকে যা একটি ত্রিমাত্রিক শিল্পকাঠামো গড়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে গতির সঞ্চার হয়েছিল নাটকে নৃত্য প্রয়োগের মাধ্যমে। আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নৃত্যনাট্যকেই কেবল ত্রিমাত্রিক গতিসম্পন্ন নাটক আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাধারণত নাটকের মঞ্চায়নে নৃত্য পরিকল্পিত হলে নাট্য নির্দিষ্ট নৃত্যগুরু বা কোরিওগ্রাফার এর মাধ্যমে নৃত্যদৃশ্যের অবয়ব তৈরি করেন এবং একাধিকবার অনুশীলনের মাধ্যমে অভিনেতাদের সেই নৃত্যে পারদর্শী করে তোলেন। *নাট্যশাস্ত্রের* চতুর্থ অধ্যায়ে তাণ্ডব লক্ষণ পর্যায়ে 'মহাদেবকে সমগ্র নৃত্য পরিকল্পনার নির্দেশনা দিতে দেখা যায়' (গায়ত্রী, ২০১১ : ১৪)। অর্থাৎ ভরতকৃত *নাট্যশাস্ত্রের* বর্ণনানুসারেই নটরাজ শিব বা মহাদেব একজন নাট্য নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। তণ্ডু ছিলেন তাঁর সহযোগী নির্বাহক। আবার নৃত্যদৃশ্য মঞ্চায়নের জন্য নৃত্যশিল্পী আনয়নের নজিরও বিরল নয়। কৈশিকী বৃত্তির নৃত্যদৃশ্য অভিনয়ের জন্য ব্রহ্মা ত্রয়োদশ অপ্সরা সৃজন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে শাস্ত্রে। কখনও কখনও নৃত্যদৃশ্য মঞ্চায়নের জন্য নৃত্য শিল্পীও

আনয়ন করা হতো বলে জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যদৃশ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারার সাথে নিজস্ব নৃত্যভাবনা সংযুক্ত করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গীকৃত *বসন্ত* নাটকের মঞ্চায়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাঁদ, বনপথ, ধূপশিখা, করবী, মালতী, মাধবী, বকুল, ঝুমকোলতা, ধুতরা প্রভৃতি চরিত্র আজ আকারে মঞ্চে উপস্থাপন করেন। মঞ্চে তাদের পরিবেশিত নৃত্য সম্পর্কে উল্লেখ আছে :

> The younger daughter of Sasanka Sen, Meneka took the role of the Moom. She was dressed in white and a round silver paper was stuck on her back representing the moon. A group of girls surrounder her and danced with the song o chand tomay dola debe ke (O Moon, who will swing you). Rabindranath directed them to come up with swaying movements symbolizing th moon, the waves and finally the univers. (Sruti, 2021 : 44)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনেতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এ নৃত্যদৃশ্যের ভাব রস মাত্র কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো চলন, মুদ্রা, দৃষ্টিভেদ বা কোনো নির্দিষ্ট নৃত্য আঙ্গিকের অনুসরণের নির্দেশনা তিনি তাদের দেননি। নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনি আরও বেশি স্বাধীন করে দিয়েছিলেন অভিনেতাদের। তাদের শুধু বলা হয়েছিল তারা সবাই যেন একসাথে মঞ্চে উপস্থিত হন এবং অভিব্যক্তি সহকারে মঞ্চজুড়ে নৃত্য করেন। বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে জানা যায় :

> [...] These dances were expressions of feelings. The movements did not come out from a matured basis of dance Vocabulary but they followed the lyrics and the rhythm to put across the end eavour of expression. (Sruti, 2021 : 44-45)

অর্থাৎ নৃত্যাংশটি কোনো শাস্ত্রীয় আঙ্গিক বা মুদ্রা মেনে পরিবেশিত হয়নি বরং তা কেবল গানের আবেগের উপর নির্ভর করে পরিকল্পিত হয়েছিল।

হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় লালিত ঐতিহ্যবাহী বাংলা-নাট্যের ধারায় মৌখিক রীতিতে পরিবেশিত আখ্যান পরিবেশনের ধারা; যা রচিত হতো মৌখিক রীতিতে অর্থাৎ এর কোনো লিখিত রূপ ছিল না এবং পরিবেশিত হতো মৌখিক রীতিতে; যা আসর থেকে আসরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতো – সেটাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটক রচনা ও নাটক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে অস্বীকার করলেও নাটকে নৃত্য সংযোজনের ক্ষেত্রে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এ প্রসঙ্গে লেখা হয় : "Everybody Joined in the wild dance and the Poet forgot his age, his gravity and his greatness and began to dance like a simple child [...]" (Sruti, 2021 : 44). অর্থাৎ এ ধরনের নৃত্যদৃশ্যে ভাব অনুযায়ী অভিনেতারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গীত ও ছন্দের তালে তালে অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করতো। তাই একই নাটকের ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চায়নে এ নাচগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেত।

কথা কাব্যের 'পরিশোধ' কবিতার ভাবকে সংগীতে পরিবর্তিত করে নৃত্যনাট্যের উপযোগী করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; নাম দেন *শ্যামা*। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের ও বিবেকের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্বই *শ্যামা*

নাটকের মূল বিষয়। নৃত্যনাট্য শ্যামার আখ্যানে দেখা যায়, বজ্রসেনের জন্য শ্যামা নিজ জীবন ত্যাগ করে সরল, নিরপরাধ ও যথার্থ প্রেমিক উত্তীয়ের জীবন গ্রহণ করে। বজ্রসেন তার এ মহাপাপমূল্যে কেনা জীবনকে বর্বরোচিত পাপের চরম নিদর্শন মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, তার প্রতি শ্যামার প্রেম যেন এক পাষাণ-হৃদয়া দানবী মানবীর যে কোনো উপায়ে জঘন্য দেহ-লিপ্সা-চরিতার্থে করা ছলনা মাত্র। তাই বজ্রসেন শ্যামাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উত্তীয়রূপী শ্যামার হত্যা দৃশ্যটি আখ্যানের দুর্বল অংশ হলেও তাণ্ডবনৃত্যসহযোগে উপস্থাপিত হয় বিধায় দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের অভিমত : "এই অংশটা নাটকের মাঝখানে দর্শকের চিত্তকে মৃত্যুর দৃশ্যে ও ঘাতকের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে রসান্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম দেয় বলেই এটি দুর্বল হলেও দর্শকবৃন্দ এ নিয়ে আপত্তি করেননি। সেইজন্য হয়তো গুরুদেব এ অংশটি বাদ দেননি" (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪৩৮)। উল্লিখিত অংশটি মহাদেব নটরাজ সৃষ্ট নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল বলে বর্তমান বিশেষজ্ঞের ধারণা। এই মহাদেবই অনার্য বিশ্বাসে শিব। 'অনার্য' সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে, 'শিবের কল্যাণে শস্য ও কৃষির সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয়' (লায়লা, ২০১৮ : ২৪)। অনার্য সম্প্রদায়ের এ দেবতাই কালক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও নাট্যের উদ্ভাবক কল্পিত হয়েছেন। নটরাজ বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
> পদযুগ ঘিরে জ্যোতিষ্যমণ্ডলীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
> তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
> যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
> সুখে দুঃখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে। (গায়ত্রী, ২০১১, : ১৪)

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে নটরাজ শিব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব অভিব্যক্তি জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং দেবতা শিবকে নৃত্যের স্রষ্টারূপে স্বীকার করেছিলেন। *নাট্যশাস্ত্র* মতে : "ভরতমুনি তণ্ডুর কাছ থেকে অঙ্গহারনৃত্তের দীক্ষা লাভ করেছিলেন" (গায়ত্রী, ২০১১ : ১৫)। ভারতীয় পুরাণ মতে, তণ্ডু নিজেই মহাদেব শিবের শিষ্য ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব ও লাস্য নামে স্বতন্ত্র দু'টি নৃত্য আঙ্গিকের উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত উভয় প্রকার নৃত্যই দেবতা শিব কর্তৃক সৃষ্ট। যদিও তাণ্ডব শব্দটি বঙ্গীয় জনপদে 'সদর্থক' রূপে স্বীকৃত নয়। এ জনপদে শৃঙ্খলাহীন, ভীতি–ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা সঞ্চারক উন্মত্ত নর্তনভঙ্গি হিসেবে তাণ্ডব নৃত্য পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাই উত্তীয়ের হত্যাদৃশ্যে হত্যাকারীর হাব-ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তাণ্ডব নৃত্যকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও *নাট্যশাস্ত্র* মতে : "তাণ্ডব নৃত্য শৃঙ্গার রস থেকে সৃষ্ট এবং এর প্রয়োগ সুকুমার ও লীলায়িত' (গায়ত্রী, ২০১১ : ১৭)।

শ্যামা নৃত্যনাট্যের মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় নৃত্যের তিনটি আঙ্গিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। *শ্যামা* নৃত্যনাট্যে শ্যামা চরিত্রের নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের প্রচলিত নৃত্য ধারায় অর্থাৎ মনিপুরী নৃত্য আঙ্গিকের আদলে। বজ্রসেন চরিত্রের কিছু অংশের নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছিল ভরতনাট্যম নৃত্যের আঙ্গিকে এবং বাকি বৃহদাংশের নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছিল কথাকলি নৃত্যের আদলে। প্রহরীর নৃত্যেও কথাকলি নৃত্য আঙ্গিক অনুসৃত হয়েছিল। তবে উত্তীয় চরিত্রের নৃত্য কল্পিত হয়েছিল নিখুঁত কত্থকের আদলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য তথা

সমগ্র রবীন্দ্রনাট্যের নৃত্য পরিকল্পনায় কত্থক নৃত্য আঙ্গিকের ব্যবহার এই প্রথম। কেবল যন্ত্রসংগীত নির্ভর নৃত্য বিধায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনোই কত্থক ধারার নৃত্যকে নাটকের নৃত্য পরিকল্পনায় ব্যবহার করেননি। কত্থক নৃত্য আঙ্গিক রবীন্দ্রনাট্যের নৃত্য পরিকল্পনায় উপেক্ষিত হয়েছিল বরাবরই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : "রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তার কপালে মৃত্যু আছে" (গায়ত্রী, ২০১১ : ১৮)। আর কত্থক অনেকাংশেই ভাবাভিনয়হীন তাললয়াশ্রিত নৃত্য কেবল।

কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*কে নৃত্যের ছাঁচে ঢেলে নৃত্যনাট্যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*র নৃত্য সংযোজনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যস্থিত সংগীতের ভাব প্রকাশের দিকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নৃত্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই তিনি এই নৃত্যনাট্যে সংগীতের সুরারোপ করেছিলেন। *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যে তিনি বিচিত্র ধারার সুর প্রয়োগ করেছিলেন; তবে গীতিকবিতাসুলভ যে ভাব বিস্তার *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যে প্রশ্রয় পেয়েছিল, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় ড্রামাটিক শর্ত পূরণ করতে গিয়ে তা অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে নাট্যস্থিত আখ্যানের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সংগীতের সাথে নৃত্য যুক্ত হওয়ায় কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*র অনেক সংলাপই নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*য় সংযোজনের প্রয়োজন পড়েনি; উদাহরণস্বরূপ প্রজাবৎসলা *চিত্রাঙ্গদা* কল্পনায় অর্জুনের উচ্চারিত বৃহৎ সংলাপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

> সিংহিনীর মতো, চারিদিকে আপনার
> বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
> কেহ কাছে নাহি আসে ভরে। ফিরিছেন
> মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী–
> বীর 'সিংহ' পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া। (মোহাম্মাদ, ১৩১৮ : ৭৩)

কাব্যনাট্যে অর্জুনকৃত এই বৃহৎ উক্তি নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*য় একটি মাত্র সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে; তা হলো : 'শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী' (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১২৩-১২৪)। সংলাপের বাকি অংশ অভিনয় ও নৃত্য সহযোগে মঞ্চে উপস্থিত হয়। *চিত্রাঙ্গদা*র এ নূতনরূপ রবীন্দ্র-সংগীতের উপর অধিক প্রাধান্য দিয়ে বিকশিত হলেও নাট্যস্থিত আখ্যান প্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নৃত্যের জোর ভূমিকা ছিল।

গদ্যছন্দে রচিত *চণ্ডালিকা* নাটক রচনার প্রায় পাঁচ বছর পর এর গদ্য-ভাষণকে সংগীতে রূপান্তর ও প্রত্যেকটি সংগীতের সঙ্গে নৃত্য সংযোজন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন নৃত্যনাট্য *চণ্ডালিকা*। নৃত্যের প্রয়োজনে এ নাটকের প্রথম দৃশ্যে ফুলওয়ালি, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা প্রভৃতি চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড কিছু অংশ নতুন করে সংযোজন করা হয়। এ নৃত্যনাট্যে পূর্ণাঙ্গ গানের সাথে সুরময় সংলাপের বিন্যাসের মাধ্যমে আখ্যান পরিবেশিত হয়েছে। তাই বিশেষজ্ঞের মতে : '*চিত্রাঙ্গদা*, *বাল্মীকি-প্রতিভা* প্রভৃতি ছিল নাট্যের সূত্রে নাচগানের মালা; *চণ্ডালিকা* হলো নাচগানের সূত্রে নাট্যের মালা' (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১৩১)। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে প্রয়োগকৃত নৃত্য সম্পর্কে জানা যায় যে, ছন্দোময় উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপের অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রচলিত মণিপুরি নৃত্য-আঙ্গিক অনুসরণ করেছিলেন। তবে মা চরিত্রকৃত মায়ানৃত্যের দৃশ্যে এর ব্যত্যয় ঘটে। এ নৃত্যে শিব-এর তাণ্ডব নৃত্যের অনুসরণ লক্ষ করা হয়।

'তাণ্ডব নৃত্য কেবলমাত্র পুরুষের নৃত্য' – প্রচলিত এ ধারা থেকে বের হয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ এ নৃত্যাংশ প্রযোজনা করেন। তাণ্ডব নৃত্যে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত :

> আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি অশান্ত, আর অন্যদিকে তারই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরকাল থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে। (গায়ত্রী, ২০১১ : ১২৩)

এভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাণ্ডবনৃত্যে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে স্বীকার করে নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে : 'সান্ধ্যনৃত্য প্রসঙ্গে শাস্ত্রে তাণ্ডব নৃত্য পরিকল্পনায় এ ধরনের কোন নির্দেশনার উল্লেখ লভ্য নয়' (গায়ত্রী, ২০১১ : ১২৩)।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল শখের বসে নৃত্যনাট্য রচনা করেননি; তিনি নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন নাটককে পরিপূর্ণতা দেবার প্রয়াস থেকে। এ প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ আছে : "সমস্ত জিনিসটা বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভালো হয়" (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪ : ১২৩)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত প্রথম নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদার* মহড়া কক্ষ থেকে এ চিঠিটি লিখেছিলেন। এখানে 'দ্রুত' বলতে গতি সম্পন্ন এবং সুঠাম বলতে 'সুগঠিত' বোঝাতে চেয়েছেন বলে ধারণা। অর্থাৎ নাটকে নৃত্য প্রয়োগের মাধ্যমে নাটক গতি পায় এবং গঠনগত দিক থেকে পরিপূর্ণতা পায় এ ধারণা থেকেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে নৃত্য সংযোজনের ব্যাপারে আগ্রহ শুরু হয়।

মানবের নৃত্য প্রচেষ্টা অনাদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহমান। "প্রাচীনকাল থেকে নৃত্যকলা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাচীনকালে কৃষি সভ্যতার স্তরেই মানব-সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল"– বলে বিশেষজ্ঞের ধারণা (লায়লা, ২০১৮ : ২৩)। তাই দ্রাবিড়দের সূর্য ও পশুপতি শিব কল্পনায় ভারতীয় নৃত্যের উদ্ভব সূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চলমান। কেননা, সূর্যই কালে কালে শিব রূপে কল্পিত হয়েছেন। শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে নাট্যের বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ধারণা লভ্য। নাট্যের পূর্ণতার ক্ষেত্রে শিবের নৃত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নৃত্য গীত-বাদ্যের সম্মিলিত যে ধারা সহস্র বৎসর পূর্বে ওড্রমাগধী রীতিতে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল, তা প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আজও বাংলা নাটকের প্রধান অবলম্বন হিসেবেই স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি ও ধ্বংসকে শিব-তাণ্ডবের অঙ্গরূপে আবিষ্কার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি :

> যখন আদিদেবের আহ্বানে সৃষ্টি উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড় ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর। (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮ : ৪২৭)

তাঁর মতে, সৃষ্টির আদিম ভাষাই নৃত্য এবং পৃথিবী ধ্বংসও হবে এই নৃত্যের তালে তালে। রবীন্দ্র-নাটক তথা বাংলা নাটকের আঙ্গিক বা রীতির সাথে নৃত্যের সংযোগ-এর বিষয়টি বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে প্রমাণিত। বাংলা নাটকের আঙ্গিক বা রীতির বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় এর

উৎপত্তির ইতিহাসের আধারেই। রবীন্দ্রনাটকের সাথেও নৃত্যের সংযোগ শুরু থেকেই। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মতে তিনটি ধাপ বা স্তর অতিক্রমণান্তে নাটক পরিণতি লাভ করেছিল। যেমন :

ক. নৃত্ত
খ. নৃত্য
গ. নাট্য।

তাই রবীন্দ্র নাটক ও নাটকে নৃত্যের স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত 'নৃত্ত' ও 'নৃত্যের' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যের ভেদ বিচার অংশে 'নৃত্ত' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও নৃত্তের বিশ্লেষণ সেখানে অনুপস্থিত। অভিনয় দর্পণ, নৃত্ত দর্পণসহ অন্যান্য *শাস্ত্রে* 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' প্রসঙ্গে বহু মত প্রচলিত আছে। নন্দিকেশ্বর তাঁর *অভিনয় দর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন যে : "নৃত্ত ভাব ও রস শূণ্য"(সেলিম, ১৯৮৯ : ৩২)। অর্থাৎ তাঁর মতে ভাবহীন, অভিনয়হীন অঙ্গবিক্ষেপ হলো নৃত্ত। অন্যদিকে 'নৃত্য' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "নৃত্য হলো নাচের সেই আঙ্গিক যাতে আছে রস, ভাব ও ব্যঞ্জনা এবং অনুরূপ বিষয়" (সেলিম, ১৯৮৯ : ৩২)। আনন্দ কুমারস্বামী নন্দিকেশ্বরের নৃত্ত সম্পর্কিত নঞর্থক সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "নৃত্ত হচ্ছে লয় সহযোগে শুধু এদিক ওদিক পদসঞ্চারণ বা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গী মাত্র" (সেলিম, ১৯৮৯ : ৩২)। পরবর্তীকালে দশরূপকার ধনঞ্জয় 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বরের মতকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। মন্মথমোহন বসু তাঁর *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে 'নৃত্ত' কে তাল-লয়াশ্রিত অঙ্গবিক্ষেতা হিসেবে স্বীকার করলেও নৃত্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "নৃত্য হলো হাবভাবযুক্ত বিবিধ-মুদ্রা-সাহায্যে কৃত মূক অভিনয়সহ নর্ত্তর" (মন্মথমোহন, ১৯৫৯ : ৩)। উল্লিখিত আলোচনা থেকে 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' সম্পর্কে যে ধারণা লভ্য তা হলো 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' উভয়ই মানবের শিল্পসত্তা প্রকাশের মাধ্যম। নৃত্ত হলো শরীরের ভাষা প্রকাশের ছন্দবদ্ধ তাল-লয়াশ্রিত স্বাধীন মাধ্যম এবং নৃত্য হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে (বিভিন্ন মুদ্রাসহযোগে) শরীরের ভাষায় নির্দিষ্ট ভাবকে ব্যক্ত করার চেষ্টা। তদ্‌বিবেচনায় বলা যায় যে 'নৃত্ত' হলো শারীরিক অঙ্গবিক্ষেপের মাধ্যমে আবেগকে প্রকাশ করা এবং 'নৃত্য' হলো শারীরিক ভঙ্গিমার আশ্রয়ে শিল্পীর নির্দিষ্ট ভাবকে ব্যক্ত করা। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় *নৃত্যদর্পণ* গ্রন্থে শিল্পের সংজ্ঞায় Art of Configuration-এর তত্ত্ব অনুযায়ী 'নৃত্ত'কে অঙ্গপাক্ষের প্রত্যক্ষ সমাযোগে রূপ বিকল্পনা বলেছেন। উল্লিখিত উভয় ধারার লক্ষণ লভ্য যথাক্রমে 'কথাকলি' নৃত্য ও 'কত্থক' নৃত্যে। কথাকলির প্রধান ঝোঁক ভাবাভিনয়ের দিকে। কত্থকের ঝোঁক তাললয়াশ্রয়ে অঙ্গহার রচনায়। তাই কথাকলির শিল্পী হয় ভাবসচেতন এবং কত্থকের শিল্পীকে আঙ্গিক সচেতন হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *'শ্যামা'* নৃত্যনাট্যের হত্যা দৃশ্য ব্যতীত অন্য কোথাও নৃত্য সংযোজনের ক্ষেত্রে কত্থক নৃত্যের ধারা অনুস্মরণ করেননি। সে বিবেচনায় বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নৃত্যনাট্যসমূহে যে নৃত্য প্রয়োগ করেছিলেন তা 'নৃত্ত' ধারার নয়; বরং 'নৃত্য' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু 'নৃত্য' শাস্ত্রীয় মুদ্রাসহযোগে ভাবপ্রকাশকে নির্দেশ করে। বর্তমানে প্রচলিত কথাকলি নৃত্য শাস্ত্রীয় মুদ্রা সহযোগে কৃত নর্তনশৈলী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নৃত্যনাট্যসমূহে নৃত্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশীয় ধারার নৃত্য আঙ্গিকসমূহের মধ্য থেকে 'কথাকলি' ধারার নৃত্য আঙ্গিক বেশি অনুস্মরণ করেছিলেন। তবে, তিনি নৃত্যনাট্যে নৃত্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় মুদ্রাসমূহ বর্জন করেছিলেন

সচেতনভাবেই। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যনাট্যের নৃত্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কথাকলি নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন; পরিবেশন কৌশল নয়।

বিশেষজ্ঞের মতে, নৃত্ত নৃত্যের পূর্ববর্তীকালের এবং অবশ্যই নৃত্তের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নৃত্যের উদ্ভব (সেলিম, ১৯৮৯ : ৩২)। ধারণা করা হয় নানান গোত্র, সংস্কার, নিবেদন, ধর্মীয় কৃত্য সম্প্রদায়ের মানুষের গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের পর্যায় হিসেবে নৃত্তের সাথে যুক্ত হয় মুদ্রা যা পরবর্তী সময়ে স্থান পায় শাস্ত্রে। এতে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত নৃত্ত নিজস্ব ধারায় বহমান থাকে এবং এর থেকে শুরু হয় নতুন আরেকটি ধারা। "নাট্যের উদ্ভবের সাথে নৃত্তের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ আছে শাস্ত্রে" (সেলিম, ১৯৮৯ : ৩)। ভরত *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে নৃত্তের আঙ্গিক বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা না করলেও শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে উদ্ভূত কৈশিকী বৃত্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনায় নৃত্তের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে কৈশিকী বৃত্তি হলো 'বহুনৃত্তগীতবাদ্য' সংযুক্ত ললিত-অঙ্গাভিনয় (সুরেশচন্দ্র, ১৯৯৬ : ১১৬)। এই 'নৃত্ত'-কে শাস্ত্রকার বলেছেন "ছন্দ ও তালসহযোগে সাধারণ অঙ্গভঙ্গী" (Ananda and Gopala, 1971 : 16)। শাস্ত্রে 'নৃত্ত' শব্দটি কৈশিকী বৃত্তির বৈশিষ্ট ব্যাখ্যায় প্রয়োগ হওয়ায় এর সাথে কৈশিকী বৃত্তি আশ্রয়ী ওড্রমাগধী নাট্যপ্রবৃত্তির সম্পর্ক কল্পিত হয়। ওড্রমাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি থেকেই বাংলা নাটকের উদ্ভব এ কথা পূর্বই স্বীকার করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলার যে ক'টি নাট্য-আঙ্গিক এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে তা সর্বতোভাবে লৌকিক নাট্যাভিনয়রীতি। তদ্‌বিবেচনায় নৃত্ত জননন্দিত লৌকিক নাট্যাভিনয়রীতি বলে ধারণা। 'নাট্যশাস্ত্রে 'অমৃত মন্থন' ও 'ত্রিপুরাদাহ' নাট্য প্রয়োগ প্রসঙ্গে কৃত নৃত্য বিষয়ক আলোচনায় শিবের নির্দেশনা এবং নির্দেশনা সহযোগীরূপে শিবানুচর তন্তুর নাম উল্লেখ আছে'।[১২] শাস্ত্র মতে, শিব নিজেই একজন সুনিপুণ নৃত্ত শিল্পী ছিলেন এবং তিনি লোকনৃত্তের অতিরিক্ত বিশিষ্ট কোনো নৃত্ত ও নাট্য পদ্ধতিতে পারদর্শী ছিলেন। ধারণা করা হয় উল্লিখিত অংশে 'লোকনৃত্তের অতিরিক্ত নৃত্ত ও নাট্য' বলতে ভরত ওড্রমাগধী নাট্যরীতির প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে পূজা-পার্বণ বা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাকৃতজনের ছন্দিত অঙ্গ-সঞ্চালনের সাথে এ 'নৃত্ত' আঙ্গিকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্য নাট্যসমূহের নৃত্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'নৃত্য' আঙ্গিক গ্রহণ করলেও 'নৃত্ত' ধারা পুরোপুরি বর্জন করেননি।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের পরিবেশনা সম্পর্কে জানা যায় যে, তা মঞ্চের পেছন থেকে বা উইংসের ভেতর থেকে পঠিত ও গীত হতো এবং অভিনেতারা মঞ্চে তা নৃত্য সহযোগে উপস্থাপন করতেন। নৃত্যনাট্যের কিছু অংশ অভিনয়ের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে নৃত্যকে স্বাধীন করে দিতেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনেতাদের নাট্যঘটনা ভাবসহ বুঝিয়ে দিতেন এবং বলতেন তারা যেভাবে খুশি সেভাবে মঞ্চে যেন তা প্রকাশ করে। অভিনেতারা এ ধরনের অভিনয়ে গীতের তালে তাল রেখে যেমন ইচ্ছা তেমন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আবেগ প্রকাশ করত।

নৃত্য সম্পর্কে ভারতীয় বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকে নৃত্য সংযোজন করেছিলেন। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নাট্যস্থিত আখ্যান পরিবেশনের জন্য ভারতীয় নৃত্যের যখন যে আঙ্গিক প্রয়োজন তা গ্রহণ করেছেন এবং নাটকের প্রকাশকে পরিপূর্ণতা দিতে তিনি পাশ্চাত্যের নৃত্য আঙ্গিকও প্রয়োগ করেছেন এবং এর সাথে যুক্ত ছিল নিজস্ব সৃজনশৈলী। নাটকের অভিনয় ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি এসকল নৃত্যআঙ্গিক

সংযোজন-বিয়োজনও করেছেন নিজের মতো করে যা নৃত্যকে নবরূপ দান করেছিল।

টীকা

১. 'কৈশিকী বৃত্তি' সম্পর্কে ভরতকৃত *নাট্যশাস্ত্রে* উল্লেখ আছে এ বৃত্তি শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে উদ্ভূত। নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ নিমিত্তে ব্রহ্মা স্বতন্ত্রভাবে ত্রয়োবিংশ অপ্সরা সৃজন করেছিলেন। *নাট্যশাস্ত্রে* এর অভিনেতা অভিনেত্রীদের বসন-ভূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভরতকৃত *নাট্যশাস্ত্র* মতে, কৈশিকী বৃত্তিতে আহার্য হবে মনোরম, এর আত্মা হচ্ছে 'ক্রিয়া' এবং 'রস'। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভরত বলেছেন যে এ বৃত্তি 'বহুনৃত্তগীতবাদ্য' সংযুক্ত ললিত অঙ্গাভিনয়। কৈশিকী বৃত্তি '*ওড্র-মাগধী*' প্রবৃত্তির অন্তর্গত। (সুরেশচন্দ্র, ১৯৮০ : ৭-৮)

২. বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত হিসেবে *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* নামে বৌদ্ধ তান্ত্রিককৃত পদসংলনই বর্তমানে চর্যাপদ নামে পরিচিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজাদরবার থেকে এই পুঁথি আবিষ্কার ও পরবর্তীতে সম্পাদনা করেন। (অসিতকুমার, ১৯৭৩ : ১৪)

৩. চর্যাপদের প্রধান পদকর্তাদের মাঝে সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, শান্তিপাদ ও শবরপাদের নাম উল্লেখযোগ্য। ভুসুকপাদ-এর একাধিক পদ *চর্যাপদে* সংকলিত আছে। (অসিতকুমার, ১৯৭৩ : ১৪)

৪. বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* যে নাটগীত শ্রেণির রচনা এ মতের সমর্থন মেলে সুকুমার সেন ও গৌরীশঙ্কর প্রদত্ত নাটগীতির সমালোচনা অংশে। (সুকুমার এবং গৌরীশঙ্কর, ১৯৭৯ : ১৪৫-১৫২)

৫. প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিল্পকলার ও রসানুভবের প্রতি বিভিন্ন আচার্যেরা পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। উপনিষদের ঋষি পরমপুরুষ সম্পর্কে বলেছেন : "রসো বে সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে এই উচ্চ আদর্শ কল্পনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রসভাবব্যঞ্জনা দ্বারা আনন্দবিধান, উপদেশদান ও মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদনা-এর যে তত্ত্ব নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে সেই তত্ত্বটি আরো সুপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্ত্র মতে রস হচ্ছে আস্বাদন। (গায়ত্রী, ২০১১ : ১৯৪)

৬. নর্তন বিশারদ উপাধিপ্রাপ্ত নৃত্যজ্ঞ শর্মিলা বন্দোপাধ্যায় ১০ মে ২০১৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তাঁর এই মত দৈনিক জনকণ্ঠের মে ১৭, ২০১৫ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭. "এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দেশী কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসা, তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়েছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিস্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব"। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৯ : ২০১-২০২)

৮. ১২ জানুয়ারি ২০২১ মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জের প্রসূণ থিয়েটার কর্তৃক পরিবেশিত *শ্রাবণগাথা* নামক

ঋতুনাট্যের পরিবেশনাদৃষ্টি এ তথ্য লভ্য। শ্রাবণগাথা মূলত বর্ষাঋতু বিষয়ক নাট্য। যেহেতু নির্দিষ্ট একটি ঋতু নিয়ে রচিত *শ্রাবণগাথা* ঋতুনাট্যটি তাই গানের সুরের মাঝে একটা সমন্বয় লক্ষ করা যায়। নৃত্যের ক্ষেত্রে সাধারণ হাও-ভাউ ও মুদ্রা ব্যবহৃত হলেও পোশাক ছিল চরিত্রানুগ।

৯. 'নর্তন বিশারদ' উপাধিপ্রাপ্ত নৃত্যজ্ঞ শর্মিলা বন্দোপাধ্যায় ১০ মে ২০১৫ সালে দৈনিক জনকণ্ঠকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথকৃত নৃত্য ধারাকে *রবীন্দ্রনৃত্য* হিসেবে স্বীকার করেন। এই সাক্ষাৎকার দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার মে ১৭, ২০১৫ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১০. "গামোলান বাজনার সাথে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে, তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অঙ্গ-প্রত্যক্ষে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী সৌকুমার্য, কী সহজ লীলা। অন্য নাচে দেখা যায়, নটী তার দেহকে চালনা করছে, এদের দেখে মনে হতে লাগলো দু'টি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা"। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯২ : ১৫৪)

১১. কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানত নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প বলা। এর থেকে এটা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যই নাচ হয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাট।

১২. "নাট্যশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে *অমৃতমন্থন* ও *ত্রিপুরাদাহ* নামে দুটি নাটক আদ্যতন। পূর্বরঙ্গে এবং নাট্যে কি প্রকার উপলক্ষে উৎকৃষ্ট নৃত্তের যোজনা করা হয়েছিল, এই কাহিনীর মধ্যে সেই উপলক্ষের বীজশ্রুতি আছে"। (গায়ত্রী, ২০১১ : ১৪)

সহায়কপঞ্জি

অতুল সুর (২০০১)। *বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন*। হাওলাদার প্রকাশনী, কলকাতা।
অতীন্দ্র মজুমদার (১৯৭২)। *চর্যাপদ*। নয়াপ্রকাশ, কলকাতা।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮৮)। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।
অবন্তীকুমার সান্যাল (১৯৯৮)। *প্রাচীন নাট্য প্রসঙ্গ*। সরস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা।
আনিসুজ্জামান (২০০৮)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা।
(১৯৬৫)। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা।
ইন্দ্রানী রায় (১৩৯৭)। *নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*। ইম্প্রেশান সিন্ডিকেট, কলকাতা।
উৎপলা গোস্বামী (১৯৯৮)। *বাংলা গানের বিবর্তন*। বিবিধ, কলকাতা।
করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৫)। *সঙ্গীতকোষ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
(২০১১)। *বাংলা গানের বিবর্তন*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৫)। *ভারতের নৃত্যকলা*। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।
(১৯৯৪)। *নৃত্য দর্পণ*। করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা।
গীতাসেন গুপ্ত (১৯৭৫)। *বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক*। জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা।
গোলাম মুরশিদ (২০০৬)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। অবসর, ঢাকা।
চৈতালী ঘোষ (১৯৯৫)। *নৃত্য-কলা সৃষ্টির ইতিবৃত্ত*। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা।
মণ্ডয়া মুখোপাধ্যায় (২০০৪)। *গৌড়ীয় নৃত্য*। দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

(২০০৩)। *ভারতীয় নৃত্যের ত্রয়ী জয়দেব-চৈতন্যদেব ও রবীন্দ্রনাথ*। এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯২)। *সঙ্গীত চিন্তা*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রণজিৎ কুমার সমাদ্দার (২০০৭)। *ভারতের লোকনৃত্য রূপ ও বিভাব*। পুনশ্চ কলকাতা।

লায়লা ফেরদৌস হিমেল (২০১৮)। *আলকাপ নাট্যে সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগশৈলী*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

শান্তিদেব ঘোষ (১৯৯৯)। *নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শেখ মেহেদী হাসান (২০০৯)। *প্রাচ্য নৃত্যের রূপ ও বিকাশ*। ঐতিহ্য, ঢাকা।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনুদিত (১৯৯৮)। *ভারত নাট্যশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড)*। নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

(১৯৯৮)। *ভারত নাট্যশাস্ত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)*। নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

(১৯৯৬)। *ভারতীয় নাট্যচিন্তা, ভরত নাট্যশাস্ত্র*। নববপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

সৈয়দ জামিল আহমেদ (১৯৯৫)। *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

সেলিম আল দীন (অনু., ১৯৮৯)। *নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ*। কথা প্রকাশন, ঢাকা।

(২০০৩)। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Srutibandapadhay (2021). *Rabindranritya.* Shubhi publication, Gurgaon,Haryana, New Delhi ।